সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ২০০৯ ❑ দশম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ৬ টাকা

মন্থন সাময়িকী

সিংহলা–তামিল বৈরিতার কালপঞ্জি পৃষ্ঠা ৩

সাক্ষাৎকার :
এক ভারতীয় তামিলের চোখে
শ্রীলংকার তামিল সমস্যা পৃষ্ঠা ৯

সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে সিংহলা–তামিল পৃষ্ঠা ১২

শ্রীলংকার তামিল সাহিত্য পৃষ্ঠা ১৫

চিঠিপত্র :
বিষয় : গত সংখ্যার সংশোধন পৃষ্ঠা ২৩

গড়ে ওঠার পাঠ পৃষ্ঠা ২৪

শর্মিলার সত্যাগ্রহের শিক্ষা পৃষ্ঠা ২

নতুন আন্দোলন

এবারের সংখ্যায় আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকায় যে মর্মান্তিক গণহত্যা ঘটানো হল, তার ওপর কিছুটা আলোচনা করতে চেয়েছি। আলোচনায় সিংহলা–তামিল বিরোধ এবং তামিল সমাজের সমস্যা অবশ্যই গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু আর একটা বিষয়ও শ্রীলংকার তিনদশকের গৃহযুদ্ধ থেকে উঠে এসেছে — রাজনীতিতে হিংসা–প্রতিহিংসার আবর্ত। শুধু আমরাই নই, সারা বিশ্বের কাছেই শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের ঘটনাবলী যথেষ্ট নজর ও শিক্ষাগ্রহণ দাবি করে। কীভাবে একটা পন্থা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আদর্শহীন করে তুলতে পারে, গোটা সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার দিকে নিয়ে যেতে পারে, শ্রীলংকা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রায় এক লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে, কয়েক লক্ষ মানুষকে গৃহহীন ও দেশছাড়া করে এখন সেখানে এসেছে কবরের শান্তি। এই শান্তি কি কখনও সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে? এই প্রশ্ন আজ আর কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

প্রায় দশবছর আগে থেকেই এরকম একটা উত্তর উঠে এসেছিল মণিপুরী কৌমসমাজের মধ্য থেকে, বিশেষত সেখানকার মেয়েদের জগৎ থেকে। ২০০০ সাল থেকে যুবতী–কবি শর্মিলার আমরণ অনশন; মশাল–বাহক (মেইরা পাইবি) ঘরোয়া মেয়েদের রাস্তায় নামা, মেয়েদের বাজার (কেইথেল) থেকে প্রবীণাদের সরাসরি সামরিক–রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ — এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এই আন্দোলন শুধু পন্থা হিসেবেই নয়, নতুন অন্তর্বস্তুতে সারা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। দলীয় রাজনীতির 'এলিট' পরিসরকে অস্বীকার করেছিল এই আন্দোলন।

২ নভেম্বর ২০০৯ শর্মিলার অনশন দশ বছরে পা দিল। সাম্প্রতিক এক কবিতায় এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

শান্তি আর ন্যায়ের উৎসব

রাইফেল–মাইফেল থেমে থাকে উপত্যকায় —
দশটা বছর ধরে একটা কবিতা লিখছে কবি,
দীর্ঘ কবিতা,
অন্ন–জল ত্যাগ ক'রে প্রাণপণ একাগ্রতায়

লোহার গরাদে বন্দী তবু
কাগজ–কলম নেই তবু
নাকে নল, অসুস্থ শরীর, তবু তবু তবু

কবিতার নাম — ছুঁড়ে ফেলো সব কালা কানুন
কবি, মণিপুরী মেয়ে, ইরম শর্মিলা চানু।

—— অমিতাভ সেন

শর্মিলার সত্যাগ্রহের শিক্ষা

জিতেন নন্দী

আমরা কয়েকজন বন্ধু যখন ২০০৪ সালে মণিপুরে গিয়েছিলাম, শর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তখন সবে কার্ফু কিছুটা শিথিল হয়েছে। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে তখনও প্যারামিলিটারির সাঁজোয়া গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। থাঙজাম মনোরমার ওপর বলাৎকার ও হত্যার বিরুদ্ধে ঘৃণা তখনও বেশ টাটকা ইম্ফলের পথে-ঘাটে-বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা শুনলাম শর্মিলার অনশন চলছে। তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করা মুশকিল। কারণ তিনি অনশন করার অপরাধে বন্দী। জে.এন. হাসপাতালের সিকিউরিটি ওয়ার্ডে তাঁকে বন্দী রাখা হয়েছে। পরে ২০০৬ সালে চিত্রনির্মাতা কবিতা জোশী ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জেনেছিলাম, শর্মিলা সেন্ট্রাল জেল সাজিওয়া-র হেফাজতে রয়েছেন। হাসপাতালে রাখতে হয়েছে, কারণ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বলপূর্বক নাকের মধ্যে দিয়ে রাবারের নল ঢুকিয়ে শরীরে খাদ্য-জল পাচার করতে হবে, যে করেই হোক —— অনশনরতা বন্দীর মৃত্যু মানে যে জাতীয় (!) বিপদ।

আন্দোলনের পন্থা হিসেবে অনশন বা ভুখ হরতাল অনেকেই করে থাকে। কিন্তু শর্মিলা আজ পর্যন্ত মুখে এক বিন্দু জলও নিজে ছোঁয়াননি। কাপড় দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করেন। সারাদিনে পাঁচবার রাষ্ট্র তাঁকে জোর করে নাক দিয়ে খাইয়ে দেয়। এমনটাই চলছে ন'বছর ধরে। ২ নভেম্বর ২০০৯ তাঁর অনশন দশম বর্ষে পদার্পন করল।

কেন এই অনশন? 'আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট ১৯৫৮' AFSPA বাতিলের দাবিতে ২ নভেম্বর ২০০০ থেকে অনশনে বসেছিলেন ইরম শর্মিলা চানু। তিনদিন পর 'আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত' হওয়ার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে আদালতের বিচারাধীন রাখা হয়।

মণিপুরে AFSPA বলবৎ রয়েছে ১৯৮০ সাল থেকে। এই আইনের বলে সেনাবাহিনী বা প্যারামিলিটারি ফোর্সের যে কেউ যে কোন সময়ে সমন ছাড়াই কাউকে নেহাত সন্দেহের বশে তল্লাসি, গ্রেপ্তার বা গুলি করে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। এমনটাই তো করা হয়েছিল থাঙজাম মনোরমাকে, আরও অনেক মণিপুরী যুবক-যুবতীকে। জনরোষের সামনে পড়ে সরকার বারবার তদন্ত কমিশন বসিয়েছে। অপরাধ প্রমাণও হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও অপরাধী সেনা বা অফিসারের শাস্তি হয়নি। আমরা যারা এরকম পরিস্থিতির মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বা কাশ্মীরে বাস করি না, তারা হয়ত মনে মনে ভাবি, আমরা তো বেশ আছি। কিন্তু এই আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী দেশের যে কোন অঞ্চলে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা হতে পারে —— যার অর্থ রাষ্ট্রের হাতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নাজেহাল হওয়া।

প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট ভারতীয় আইন অনুযায়ী শর্মিলাকে একবার ছেড়ে দেওয়া হয়। ফের ক'দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়। আইনের এই প্রহসন চলছে ন'বছর ধরে। ২০০৬ সালে ২ অক্টোবর গান্ধীর জন্মদিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গোপনে দিল্লি গিয়ে রাজঘাটে গান্ধীর সমাধি পরিদর্শন করলেন। এরপরই যন্তর মন্তরে গিয়ে ফের অনশন শুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকাল সায়েন্সেসে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর ভাই ইরম সিংহজিত সিং দিল্লি হাইকোর্টে এই গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। ২৮ নভেম্বর শর্মিলা তাঁর নাকের নল খুলে ফেলেন। কিন্তু আবার তাঁকে খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

শর্মিলা অনশন শুরু করার পর মণিপুরের শহরাঞ্চলের কিছু অংশে AFSPA শিথিল করা হয়েছিল। ২০০৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই কালা আইনকে কিছুটা সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই!

২৮ বছর বয়সে শর্মিলা যখন অনশন শুরু করেছিলেন, তখন মণিপুরের যুবসমাজ এক গভীর হতাশায় ডুবতে বসেছিল। একদিকে দীর্ঘ সশস্ত্র আন্দোলন ও প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপ, অন্যদিকে সংসদীয় রাজনীতির দুর্নীতি ও প্রহসন —— এক রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছিল। সমাজে এই দুই পথই গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছিল। শর্মিলা এক সাধারণ যুবতী হিসেবে এই সংকট থেকে সমাজকে মুক্ত করতে নিজেই ব্যক্তিগত ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গতানুগতিক রাজনীতিতে আজ যারা ক্লান্ত, তারা তো তাঁর কাছ থেকে এই ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষাটুকু নিতে পারি।

২০০৬ সালে মণিপুরে শর্মিলার সঙ্গে চিত্র-নির্মাতা কবিতা জোশীর সাক্ষাৎকার

কবিতা : আপনি কেন এই অনশন শুরু করেছিলেন?

শর্মিলা : আমার মাতৃভূমির জন্য। যতক্ষণ না ওরা আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট ১৯৫৮ তুলে নেবে, আমি উপবাস ভঙ্গ করব না।

কবিতা : আপনি কি সেই ঘটনাটা সম্পর্কে বলবেন, যা আপনাকে এতখানি উত্তেজিত করেছিল?

শর্মিলা : আমি একটা সভায় যোগ দিতে ওখানে (মালোম) গিয়েছিলাম। সভায় ক'দিনের মধ্যেই একটা শান্তি মিছিলের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মৃতদেহের ছবি দেখে আমার বেশ খারাপ লাগল। ঘটনাটা আমাকে এই মৃত্যুর সূত্রপাত নিয়ে কিছু করার ব্যাপারে মনোবল জোগালো। কারণ নিরপরাধ মানুষের সশস্ত্র বাহিনীর হিংসার শিকার হওয়া বন্ধ করার আর কোন উপায় ছিল না। শান্তি মিছিল করা আমার কাছে অর্থহীন মনে হল। এমন কিছু আমার করা দরকার ছিল, যা পরিস্থিতিটা বদলাতে পারবে।

কবিতা : কিন্তু আপনি এই উপায়টা বেছে নিলেন কেন? কেন এই আমরণ অনশন?

শর্মিলা : এই একটা উপায়ই তো আমার আছে। কারণ ভুখ হরতাল আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তি করে করতে হয়।

কবিতা : আপনার শরীর-স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব?

শর্মিলা : সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমাদের সকলকেই মরতে হবে।

কবিতা : আপনি কি নিশ্চিত, এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়? নিজের ওপর আঘাত দেওয়া?

শর্মিলা : এটা নিজেকে আঘাত দেওয়া নয়। এটা কোন শাস্তি নয়। আমি মনে করি এটা আমার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

কবিতা : আপনার পরিবার এই উপবাসকে কীভাবে দেখছে?

শর্মিলা : আমার মা আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুরোটাই জানেন। যদিও তিনি লেখাপড়া শেখেননি। কিন্তু আমার কর্তব্য পালন করতে দিতে তাঁর সাহস রয়েছে।

... পরবর্তী অংশ ২৩ পৃষ্ঠায়

সিংহলা–তামিল বৈরিতার কালপঞ্জি

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, লংকাদ্বীপে মানুষের বাস শুরু হয়েছিল প্রায় চৌত্রিশ হাজার বছর আগে। আন্দাজ করা হচ্ছে, বালানগোড়া অঞ্চলে গুহাবাসী শিকারী মানুষের বাস ছিল। অগ্নিপুরাণ, রামায়ণ, ভাগবত, বৃহৎসংহিতা, মহাভারত এবং পালিভাষায় বৌদ্ধভিক্ষুদের দ্বারা লিখিত রচনায় এই দ্বীপের কথা জানা যায়। এছাড়া টলেমি, চীনা পর্যটক ফা হিয়েন ও হিউ-এন সাঙের বর্ণনায় এই দ্বীপের কথা বলা হয়েছে। এই দ্বীপ সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় পুরাকাহিনী রামায়ণে। রামায়ণে 'লংকাকাণ্ড' নামক একটি অধ্যায়ও রয়েছে। লংকার রাজা রাবণের হাত থেকে রামের সীতা উদ্ধারের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। তবে গবেষকদের মধ্যে এমনও একটি ধারণা রয়েছে যে, এই কাহিনী হল ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ক্রমাগত দক্ষিণমুখী অভিযানেরই এক কাব্যিক বর্ণনা। 'মহাবংশ' হল শ্রীলংকার সবচেয়ে পরিচিত উপাখ্যান। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা এটি পালি ভাষায় লেখা হয়েছিল ষষ্ঠ শতকে। চতুর্থ শতকে রচিত 'দ্বীপবংশ' নামক উপাখ্যান বা গাথারই পরিমার্জিত সংস্করণ মহাবংশ। নামের মধ্যেই রয়েছে এর বংশগত ধারাবিবরণীর চরিত্রের পরিচয়। এর কেন্দ্রীয় নায়কের নাম বিজয়। তিনি বুদ্ধের মৃত্যু বা নির্বাণের দিন দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন। সিংহলা (স্থানীয় উচ্চারণ) এবং তামিল বসতি প্রথম কবে গড়ে উঠেছিল, তা নিয়ে ঐকমত্য নেই। তবে উভয় সম্প্রদায় বাইরে থেকে দ্বীপে এসেছিল। সিংহলারা অনেকেই 'মহাবংশ'-কে সূত্র হিসেবে মনে করে। তামিল সাহিত্যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার ঘটনাকে সিংহলের উত্তরাঞ্চলে তামিল বসতি গড়ে ওঠার যোগসূত্র হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৩৭ সাল নাগাদ দক্ষিণ ভারত থেকে সেনা ও গুত্তিকা নামে দুই অভিযাত্রী অনুরাধাপুরার সিংহাসন দখল করেন। সম্ভবত এটাই ছিল এই দ্বীপের কৌমগত বিরোধ এবং অশান্তির সূত্রপাত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শ্রীলংকায় ৮১.৯% সিংহলা, ৫.১% ভারতীয় তামিল, শ্রীলংকান তামিল (২০০১-এর আগেকার সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায়) ৪.৩%, মুর (আরব থেকে আগত তামিল ভাষাভাষী মুসলমান) ৮% এবং সামান্য বার্গার (ইউরোপীয় বংশধর) ও আদিবাসী ভেদ্দা।

আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব থেকেই ইতিহাসের মধ্যে এই বিরোধের ধারাকে সন্ধান করতে চেয়েছি। লংকাদ্বীপ এর প্রাচীন নাম, ঔপনিবেশিক আমলে নাম হয়েছিল সিলন এবং ১৯৭২ সালে নামকরণ হয় শ্রীলংকা। সূত্র : উইকিপিডিয়া, কে.এম.ডি সিলভা লিখিত হিস্ট্রি অফ শ্রীলংকা।

প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব

খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩–৫০৩	বিজয়ের রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ৫০৪–৪৭৪	বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসদেবের রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৪–৪৫৪	পাণ্ডুবাসদেবের পুত্র অভয়ের রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৪–৪৩৭	অভয়ের ছোটোভাই তিসসো-র রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৭–৩৬৭	অনুরাধাপুরায় অভয় ও তিসসোর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুকাভয়ের রাজত্বকালে কৃষির জন্য প্রথম সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।
খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৭–৩০৭	পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুতাশিবের রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ৩০৭–২৬৭	মুতাশিবের পুত্র দেবনমপিয়া তিসসোর রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ২৬৭–২৫৭	মুতাশিবের পুত্র উত্তীয়-র রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ২৫৭–২৪৭	মুতাশিবের পুত্র মহাশিবের রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭–২৩৭	পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র সুরাতিসসোর রাজত্বকাল।
খ্রিস্টপূর্ব ২৩৭–২১৫	সুরাতিসসোকে যুদ্ধে পরাজিত করে দুই চোলা রাজা সেনা ও গুত্তিকা রাজত্ব করেন। তিনটি প্রাচীন ভারতীয় তামিল রাজ্যের মধ্যে অন্যতম চোলা রাজবংশ।
খ্রিস্টপূর্ব ২০৫–১৬১	এরপর খ্রিস্টপূর্ব ২১৫ থেকে ২০৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন আসেলা। খ্রিস্টপূর্ব ২০৫ সালে দক্ষিণ ভারতের চোলা রাজা এলারা এসে আসেলাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এলারা শ্রীলংকার উত্তরে মহাভেলি অঞ্চলে রাজত্ব করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ পর্যন্ত।
খ্রিস্টপূর্ব ১৬১–১০৩	এলারার রাজত্বকালে বৌদ্ধ রাজাদের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোটো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে রুহুনার রাজা কাভান তিসসার জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্তগামিনী অভয় এলারাকে পরাজিত করেন।
খ্রিস্টপূর্ব ১০৩–৮৯	এইসময় পরপর পাঁচ দ্রাবিড় রাজার রাজত্বের কথা জানা যায়।
খ্রিস্টপূর্ব ৮৯ থেকে	[illegible] রাজবংশের পরপর উনিশজন রাজা এবং একজন রাণী ক্ষমতায় আসেন।
৬৬–৪৩৬ খ্রিস্টাব্দ	লম্বকর্ণ প্রজাতির ছাব্বিশজন রাজা রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে মহানামার পুত্র সোত্তিসেনা এক তামিল মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৪৩৬–৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ	পাণ্ডু নামে এক তামিল যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটে। পরপর ছ'জন দ্রাবিড় রাজা রাজত্ব করেন।
৪৬৩–৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ	মৌর্য রাজবংশের উনত্রিশজন রাজা রাজত্ব করেন। ৬৮৩–৬৮৪ সালে তামিল ব্যক্তিদের এই রাজ্যে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।
৬৮৪–৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ	পল্লব রাজবংশের সহায়তায় ছ'জন লম্বকর্ণ রাজা রাজত্ব করেন।
৭৭৭–১০০৭ খ্রিস্টাব্দ	রাজারাতার কুড়িজন রাজা অনুরাধাপুরা এবং অন্য রাজধানী থেকে রাজত্ব করেন। সর্বশেষ রাজা মাহিন্দ (পঞ্চম) চোলা রাজা রাজারাজার হাতে পরাজিত হয়ে রুহুনাতে পালিয়ে যান। পরে ভারতে এসে তাঁর মৃত্যু হয়।
৯৮৫–১১২০ খ্রিস্টাব্দ	সাতজন চোলা তামিল রাজা রাজত্ব করেন।
১০২৯–১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ	রাজারাতায় আট তিতুলার রাজা রাজত্ব করেন।
১০৫৫–১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ	রাজারাতার সাত বৌদ্ধ রাজা পোল্লোনারুভা থেকে রাজত্ব করেন।
১১৮৭–১২১২ খ্রিস্টাব্দ	কলিঙ্গ রাজবংশের আট রাজা এবং তিনজন রাণী রাজত্ব করেন।

১২১২–১২১৫ খ্রিস্টাব্দ	দক্ষিণ ভারতের পরাক্রম পাণ্ড্য এসে রাজ্যস্থাপন করেন।
১২১৫–১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ	জাফনায় কলিঙ্গ যুবরাজ কুলিঙ্গাই চক্রবর্তী রাজত্ব করেন।
১২৫৫–১২৬২ খ্রিস্টাব্দ	তাম্রলিঙ্গ বংশের চন্দ্রভানু রাজত্ব করেন।
১২৬২–১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ	আর্যচক্রবর্তী বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করেন।
১৪৫০–১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ	কোট্টেতে ভুবনেকাবাহু (ষষ্ঠ) রাজত্ব করেন।
১৪৬৭–১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ	পুনরায় আর্যচক্রবর্তী বংশের আট রাজা রাজত্ব করেন।
১২২০–১২৭০ খ্রিস্টাব্দ	দাম্বোদেনিয়া থেকে তিন সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১২৭২–১২৮৬ খ্রিস্টাব্দ	ইয়াপাহুভা থেকে তিন সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১২৮৭–১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ	পোল্লোনারুভা থেকে সিংহলা রাজা পরাক্রমবাহু (তৃতীয়) রাজত্ব করেন।
১২৯৩–১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দ	কুরুনাগালা থেকে পাঁচ সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৩৪৪–১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ	দেদিগামা থেকে পরাক্রমবাহু (পঞ্চম) রাজত্ব করেন।
১৩৫৭–১৪০৮ খ্রিস্টাব্দ	গামপোলা থেকে দুই সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৩৯২–১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ	রাইগামা থেকে তিন সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৪১২–১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ	কোট্টে থেকে ন'জন সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৫২১–১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ	সিতাওয়াকা থেকে দুই সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৫৯১–১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ	কান্ডি রাজ্যে কোন্নাপু বান্দারা রাজবংশের পাঁচ সিংহলা রাজা রাজত্ব করেন।
১৭৩৯–১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ	কান্ডি রাজ্যে নায়াকার রাজবংশের চার রাজা রাজত্ব করেন।

ঔপনিবেশিক পর্ব

১৫৮০–১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ	পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসন।
১৬৪০–১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ	ডাচ ঔপনিবেশিক শাসন।
১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ডাচেদের কাছ থেকে উপকূলভাগের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়।
১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ	কান্ডিয়ান কনভেনশনে ইংল্যান্ডের রাজাকে কান্ডির রাজা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।
১৮৩০–১৮৭০	ব্রিটিশেরা কফি প্ল্যান্টেশন শুরু করে। কান্ডিয়ান অঞ্চলের চাষিরা দারিদ্র্য সত্ত্বেও মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে অস্বীকার করে। ব্রিটিশেরা দক্ষিণ ভারত থেকে তামিল এবং অন্যান্যদের নিয়ে এসে ঠিকা প্রথায় কাজে লাগায়। ১৮৭০-এর দশকে এই কফি-অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।
১৮৮০-র দশক	ব্রিটেনের বড়ো বড়ো ইংরেজ কোম্পানিরা ব্যাপক আকারে চায়ের প্ল্যান্টেশন শুরু করে।
১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্রিটিশ শাসকেরা সেমি-ইউরোপীয় বার্গারদের কিছুটা স্বশাসনের অধিকার দেয়। শাসনকার্যে ব্রিটিশ গভর্নরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়। এতে তিনজন ইউরোপীয় এবং একজন করে সিংহলা, তামিল ও বার্গার প্রতিনধি রাখা হয়।
১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ	পার্টি-নির্বাচিত অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে এই স্বশাসন সাংবিধানিক অধিকার পেল।
১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ	তামিল নেতা পুনমবালাম অরুনাচলম ন্যাশনাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সিংহলা ও তামিলদের সমর্থনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।
১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ	'জাফনা স্টুডেন্টস কংগ্রেস' গঠিত হয়।
১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ	সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে তামিল, সিংহলা ও বার্গার এলিটরা প্রতিবাদ করল।
	প্রকাশ করে তাতে লেখেন, মুসলমানরা জাতি হিসেবে তামিলদের অন্তর্ভুক্ত।
১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	কলম্বোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় নামে ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধরা।
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	অধিকতর স্বশাসনের দাবি নিয়ে 'সিলন ন্যাশনাল কংগ্রেস' গড়ে ওঠে। কিন্তু জাতিগত বিরোধে এই দল ভেঙে যায়।
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ	নেহরু, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতারা দ্বীপে আসেন এবং সেখানে 'কলম্বো ইয়ুথ লিগ', 'জাফনা ইয়ুথ কংগ্রেস' এবং গুনসিঙ্গে-র শ্রমিক সংগঠন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে।
১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ	সংবিধান সংস্কারের জন্য ডোনাওমোর কমিশন গঠিত হয়।
১৯৩৪–৩৫	ম্যালেরিয়ার মড়কে ১০ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং ১,২৫,০০০ মানুষ মারা যায়।
১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীনতার দাবি নিয়ে ট্রটস্কিপন্থী 'লংকা সম সমাজ পার্টি' গঠিত হয়।
১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ	স্টেট কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার পর LSSP-র নেতা এন.এম.পেরেরা ও ফিলিপ গুনবর্ধেনা সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির বদলে সিংহলা ও তামিলের স্বীকৃতি চাইলেন। নভেম্বরে স্টেট কাউন্সিলে গৃহীত হল, মিউনিসিপাল ও পুলিশ কোর্টের বিবরণ মাতৃভাষায় লেখা হবে। সিদ্ধান্তটি লিগাল সেক্রেটারির কাছে পাঠানো হল।
১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ	**স্বতন্ত্র তামিল পরিচয়ের দাবিকে ঘিরে প্রথম সিংহলা-তামিল দাঙ্গা হয় নাভালাপিটিয়া-তে।**
১৯৩৯-৪০	ব্রিটিশ মালিকানাধীন প্ল্যান্টেশন এস্টেটগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হয়।
১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ	জি.জি.পুনমবালাম 'অল সিলন তামিল কংগ্রেস' ACTC গঠন করেন। ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড সোলবারির নেতৃত্বে সোলবারি কমিশনের কাছে জি.জি. পুনমবালাম স্বাধীন সিলনে ৫০% সিংহলা ও ৫০% অন্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। জে.আর.জয়বর্ধনে স্টেট কাউন্সিলে সরকারি ভাষা হিসেবে সিংহলার সুপারিশ করলেন। ডি.এস.সেনায়েক-এর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা ডোনাওমোর

কমিশন ও সোলবারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া সংবিধান রচনা করে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ — ডি.এস.সেনানায়েক 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি' UNP গঠন করেন। ব্রিটিশরা তাঁর সঙ্গে একটা নতুন সংবিধান তৈরির ব্যাপারে একমত হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ — পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে UNP বন্দরনায়েকের 'সিংহলা মহাসভা' ও পুনমবালামের ACTC–র সঙ্গে জোট বাঁধে। এস.জে.ভিচেলভানায়কম পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ শাসকেরা এই জোট সরকারের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে প্রস্তুত হয়।

উত্তর ঔপনিবেশিক পর্ব

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ — ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীলংকা 'ডোমিনিয়ন অফ সিলন' বা স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ হিসেবে স্বাধীনতা পায়। জি.জি.পুনমবালামের ACTC এবছরই UNP–তে যুক্ত হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ — মোট জনসংখ্যার ১০% প্ল্যান্টেশন এস্টেটের তামিল শ্রমিকদের সরকার ভোটাধিকার না দেওয়ায় এস.জে.ভি.চেলভানায়কম ACTC থেকে বেরিয়ে 'ফেডারেল পার্টি' গঠন করেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল শ্রীলংকায় এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করা।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ — সলোমন বন্দরনায়েক UNP থেকে বেরিয়ে এসে 'শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি' SLFP গঠন করেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ — নির্বাচনে তামিল অঞ্চলগুলিতে জয়লাভ করে ফেডারেল পার্টি মূল তামিল পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। SLFP ও UNP–র মদতে পার্লামেন্টে 'সিংহলা অনলি অ্যাক্ট' পাশ হয়। LSSP, কমিউনিস্ট পার্টি (সিলন) এবং তামিল জাতীয়তাবাদী দলগুলি এই আইনের বিরোধিতা করে। তামিলদের বিক্ষোভের পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে চেলভানায়কম সত্যাগ্রহ শুরু করলে এক সিংহলা জনতার আক্রমণে তা ভেঙে যায়। গাল ওয়া ও পাদাভিয়া অঞ্চলে সিংহলা কর্মীরা ওই এলাকার তামিলদের ওপর হামলা করে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ — সিংহলা–তামিল দাঙ্গার জন্য ফেডারেল পার্টিকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৫০–২০০ তামিল দাঙ্গায় নিহত হয়, ২৫ হাজারের বেশি তামিল শরণার্থীকে দ্বীপের উত্তরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ — 'তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ (স্পেশাল প্রভিসন্স) অ্যাক্ট'–এর মাধ্যমে তামিল ভাষাকে সীমাবদ্ধ কিছু ছাড় দেওয়া হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ — ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের একটি চুক্তি হয়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ — ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের আর একটি চুক্তি হয়। এই দুই চুক্তি মারফত সিদ্ধান্ত হয়, ১৫ বছরের মধ্যে ছ'লক্ষ এস্টেট তামিলকে ভারতে চলে যেতে হবে এবং বাকি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার এস্টেট তামিলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

৫–১০ এপ্রিল ১৯৭১ — ৫ এপ্রিল রাত এগারোটায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করে 'জনতা বিমুক্তি পেরামুনা' JVP। ১৯৬০–এর দশকে রোহানা উইজিউইরার নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীটি প্রথমে গড়ে উঠেছিল নিম্নবর্গ কারাভা ও দুরাভা গোষ্ঠীর মধ্যে। পরে ছাত্র ও বেকার যুবকেরা, এমনকী দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিম উপকূলের কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও এই গোষ্ঠীর দিকে এগিয়ে আসে। ১০ এপ্রিলের মধ্যে মাতারা জেলা এবং গল্লে জেলার আম্বালানগোড়া শহর বিদ্রোহীদের দখলে আসে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাহায্য নিয়ে শ্রীলংকার সরকার দু'সপ্তাহে প্রায় ১০ হাজার কিশোর–তরুণ অভ্যুত্থানকারীকে হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমন করে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ — ফেডারেল পার্টি, সিলন ওয়ার্কার্স কংগ্রেস ও ACTC 'তামিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠন করে। ১৯৬০–এর দশকে ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ সহ কিছু যুবকের সশস্ত্র কার্যকলাপের মধ্য থেকে ১৯৭২ সালে 'তামিল নিউ টাইগার্স' TNT গঠিত হয়। প্রথম সহস্রাব্দে চোলা সাম্রাজ্যের প্রতীক ছিল বাঘ। TULF এদের 'আমাদের ছেলেরা' বলে সমর্থন করত।

২২ মে ১৯৭২ — শ্রীলংকা প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ — 'পলিসি অফ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন'–এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সিংহলা ছাত্রদের সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল ছাত্রসংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। এইবছরই ফেডারেল পার্টি আলাদা তামিল রাষ্ট্রের দাবি তোলে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ — ফেডারেল পার্টি অন্য তামিল পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে 'তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট' TULF গঠন করে। প্রভাকরণ জাফনার মেয়র আলফ্রেড দুরিয়াপ্পাকে হত্যা করেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ — এই প্রথম তামিলরা একই দ্বীপের অভিন্ন পরিচয়ে বাস করতে অস্বীকার করে। TULF–এর ভাত্তুকোত্তাই জাতীয় কনভেনশনে 'তামিল ইলম' (তামিল শ্রীলংকা) অনুমোদিত হয়। TNT থেকেই এইসময় 'লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম' LTTE–র জন্ম হয়। এর প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন আন্তন বালাসিঙ্গম নামে কলম্বোর ব্রিটিশ হাই

কমিশনের এক প্রাক্তন কর্মী, পরে তিনি ব্রিটেনে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ — নির্বাচনে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচার করে TULF বেশিরভাগ তামিল আসন জিতে নেয়। সিংহলা-প্রধান এলাকায় সুসংগঠিত আকারে কয়েকটি সিংহলা-তামিল দাঙ্গা হয়। প্রভাকরণ তামিল এমপি এম.কানাগারত্নম-কে হত্যা করেন।

১৯৮০ — এই দশকের গোড়ায় 'ইলম রেভোলিউশনারি অর্গানাইজেশন অফ স্টুডেন্টস' EROS নামে এক তামিল জঙ্গি গেরিলা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

১৯৮১ — LTTE থেকে বেরিয়ে আসে মার্ক্সবাদী মনোভাবাপন্ন সিংহলা ভেল্লালা (চাষি) জাতের অধিক উপস্থিতি নিয়ে 'পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন অফ তামিল ইলম' PLOTE।

৩১ মে – ২ জুন ১৯৮১ — জাফনা পাবলিক লাইব্রেরি, তামিল সংবাদপত্রের দপ্তর এবং জাফনার পার্লামেন্ট সদস্যের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। চারজন মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, উর্দিধারী পুলিশ অফিসারেরা এতে যুক্ত ছিল।

গৃহযুদ্ধের পর্ব

২৩ জুলাই ১৯৮৩ — জাফনায় মিলিটারি কনভয়ের ওপর LTTE—র অতর্কিত আক্রমণে ১৫জন সৈন্য মারা যায়।

২৪–২৯ জুলাই — ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় কলম্বোর কানাট্টে কবরস্থানে এই ১৫জন সৈন্যকে সমাধিস্থ করতে গেলে এক সিংহলা জনতা সংগঠিতভাবে সরকারি সহায়তায় দাঙ্গা শুরু করে। ২৯ জুলাই পর্যন্ত এই দাঙ্গায় ৪০০ থেকে ৩০০০ তামিল মারা যায়, ১০ হাজার ঘর ধূলিসাৎ হয়, অসংখ্য তামিল পরিবার অন্যান্য দেশে পালিয়ে যায়। শরণার্থীর সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার হয়ে গেলে সরকার ভারতের সাহায্য নিয়ে জাহাজে তাদের উত্তরাংশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

৩০ নভেম্বর ১৯৮৪ — উত্তর-পূর্বের মুল্লাইতিভু জেলার দুটি গ্রামে LTTE হত্যাকাণ্ড চালায়।

১৪ মে ১৯৮৫ — সরকারি বাহিনী কুমুদিনী নামে নৌকা হামলায় ২৩জনের বেশি তামিলকে হত্যা করে। এর প্রত্যাঘাতে অনুরাধাপুরায় আক্রমণ চালিয়ে LTTE সিংহলা শিশু, মহিলা সহ মোট ১৪৬জনকে হত্যা করে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ — ভুটানের থিম্পুতে LTTE-র সঙ্গে সরকারের শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ — ফের সংঘাতে বহু সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ শ্রীলংকার সেনাবাহিনী LTTE যোদ্ধাদের জাফনা শহরে কোণঠাসা করে ফেলে। লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে। সংশোধিত সংবিধানের অধ্যায়-৪ অনুযায়ী সিংহলা ও তামিল উভয় ভাষা সরকারি ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়। সেনাবাহিনী তামিল জঙ্গিদের ঘাঁটি জাফনা শহর অবরুদ্ধ করে। এতে বহু মানুষ হতাহত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শ্রীলংকার আক্রমণ বন্ধ করার আবেদন করেন এবং ব্যর্থ হন।

২ জুন — ভারত তামিলদের সাহায্যের জন্য শ্রীলংকার উত্তরদিকে জাহাজ পাঠায়। শ্রীলংকার নৌবাহিনী এগুলিকে বাধা দেয়।

৪ জুন — তামিলদের জন্য ভারত আকাশপথে ২৫ টন খাদ্যসামগ্রী অবরুদ্ধ অঞ্চলে নিক্ষেপ করে।

২৯ জুলাই — শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জে.আর.জয়বর্ধনে ভারতের এই হস্তক্ষেপের ফলে ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ২৯ জুলাই একটা ভারত-শ্রীলংকা চুক্তি হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় : প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে; তামিল ভাষাকে সরকারি মর্যাদা দেওয়া হবে এবং উত্তর ও পূর্বে আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ভারত থেকে 'ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স' IPKF পাঠানো হবে। শ্রীলংকার সেনাবাহিনী উত্তরাঞ্চলের অপারেশন বন্ধ করে। LTTE ছাড়া বেশিরভাগ তামিল গোষ্ঠী অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে একমত হয়। এইসময় দ্বীপের দক্ষিণাংশে JVP বিদ্রোহ শুরু করে।

২৬ সেপ্টেম্বর — ভারত সরকার তামিলদের রাজনৈতিক দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় LTTE নেতা লেফটেনান্ট কর্নেল থিলীপান অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন।

৪ অক্টোবর — শ্রীলংকার নৌবাহিনী পয়েন্ট পেড্রোর কাছে LTTE—র বোট আটক করে।

৮–১০ অক্টোবর — IPKF-এর ওপর আক্রমণ শুরু করে LTTE। LTTE-র ঘাঁটিগুলিতে পাল্টা আঘাত হানে IPKF। তাদের অপারেশন চলতে থাকে।

নভেম্বর ১৯৮৮ — LTTE-র সঙ্গে সংঘাত শুরু হওয়ায় ভারত সরকার বিকল্প তামিল গ্রুপ 'ইলম পিপলস রেভোলিউশনারি লিবারেশন ফ্রন্ট' EPRLF—কে মদত দেয়। এই গোষ্ঠী নির্বাচনে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৮৯ — ২ জানুয়ারি রনসিংঘে প্রেমাদাসা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি তিনমাসের মধ্যে IPKF—কে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বলেন। রাজীব গান্ধী এই দাবি নাকচ করে দেন। ডিসেম্বরে ভি.পি.সিং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সিদ্ধান্ত বদল হয়।

২৪ মার্চ ১৯৯০ — দীর্ঘ সময় ধরে IPKF—কে দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার দাবি করার পর ২৪ মার্চ IPKF—এর শেষ জাহাজ দ্বীপ ছাড়ে। IPKF-এর ৩২ মাস থাকাকালীন ১১০০ IPKF এবং ৫০০০-এর বেশি শ্রীলংকাবাসী মারা যায়।

১০ জুন — LTTE-র সঙ্গে প্রেমাদাসা সরকারের শান্তি আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর সাময়িক

	যুদ্ধবিরতির অবসান হয়। ৬০০জন তামিল ও মুসলমান পুলিশ–কর্মচারীকে LTTE হত্যা করে।
অক্টোবর	২৮ হাজার মুসলমান বাসিন্দাকে LTTE জাফনা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে।
মে ১৯৯১	তামিলনাড়ুতে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধীর মৃত্যু হয়।
জুলাই	ইয়াপানায়া (জাফনা) উপদ্বীপের এলিফ্যান্ট পাস সামরিক ঘাঁটি ঘিরে রাখে ৫০০০ LTTE যোদ্ধা। এক মাস ব্যাপী সংঘর্ষে দু'পক্ষের ২০০০–এর বেশি মানুষ মারা যায়।
অক্টোবর	পাল্লিয়াগোড়েল্লা হামলায় LTTE–র হাতে ১০৯জন সাধারণ মুসলমান নাগরিক নিহত হয়। শ্রীলংকা সরকার তামিল গ্রামগুলির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমান হোম গার্ডদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দেয়।
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২	বারবার আক্রমণ করেও শ্রীলংকার সামরিক বাহিনী LTTE–র হাত থেকে জাফনা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।
মে ১৯৯৩	LTTE–র আত্মঘাতী হামলায় শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রণসিংহে প্রেমাদাসা নিহত হন।
নভেম্বর	পুনেরিন–এর যুদ্ধে LTTE জয়লাভ করে।
১৯৯৪	পার্লামেন্ট নির্বাচনে UNP–কে হারিয়ে 'পিপলস অ্যালায়েন্স' ক্ষমতায় আসে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন এই জোটের পক্ষে চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। তাঁর বিরোধী প্রার্থী গামিনী ডিসসানায়েকে LTTE–র হাতে নিহত হন।
১৯৯৫	জানুয়ারিতে দু'পক্ষের যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। ১৯ এপ্রিল LTTE যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে। সরকার ফের LTTE–র হাত থেকে জাফনা পুনরুদ্ধারের অভিযানে নামে। ৫ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অনুরুদ্ধা রাতওয়াত্তে জাফনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সরকারি হিসেবে দু'পক্ষ মিলিয়ে ২৫০০ জন নিহত হয়, ৭০০০জন আহত হয়। LTTE সহ সাড়ে তিন লক্ষ সাধারণ নাগরিক জাফনা ছেড়ে ভান্নি অঞ্চলে পালিয়ে যায়।
১৯৯৬	জানুয়ারিতে কলম্বো সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে LTTE–র আত্মঘাতী হানায় ৯০জন নিহত এবং ১৪০০ মানুষ আহত হয়। LTTE 'অপারেশন আনসিজিং ওয়েভস' শুরু করে। জুলাইয়ে মুল্লাইতিভুর যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। আগস্টে সরকার পাল্টা আক্রমণ করে। দু'লক্ষ সাধারণ বাসিন্দা পালিয়ে যায়। ২৯ সেপ্টেম্বর সামরিক বাহিনী কিলিনোচ্চি শহর দখল করে।
১৯৯৭	১৩ মে ২০ হাজার সরকারি ফৌজ LTTE নিয়ন্ত্রিত ভান্নি অঞ্চলে একটা সরবরাহ লাইন খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। অক্টোবরে LTTE শ্রীলংকান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বর্ষণ করে।
১৯৯৮	জানুয়ারিতে LTTE কান্ডিতে বোমা বর্ষণ করলে বিখ্যাত বৌদ্ধ সমাধি 'টেম্পল অফ দ্য টুথ' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর তারা 'অপারেশন আনসিজিং ওয়েভস ২' শুরু করে। কিলিনোচ্চির যুদ্ধে তারা জয়ী হয়।
১৯৯৯	মার্চে সামরিক বাহিনী দক্ষিণ থেকে ভান্নিতে আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বরে গোনাগালা–তে LTTE ৫০জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। ২ নভেম্বর শুরু হয় 'অপারেশন আনসিজিং ওয়েভস থ্রি'। ডিসেম্বরে LTTE–র আত্মঘাতী হামলায় প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
২০০০	২২ এপ্রিল LTTE এলিফ্যান্ট পাস মিলিটারি কমপ্লেক্স দখল করে নিলে জাফনা উপদ্বীপের সঙ্গে ভান্নির মূল ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডিসেম্বরে LTTE একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।
২০০১	২৪ এপ্রিল LTTE যুদ্ধবিরতি তুলে নেয় এবং উত্তরের দিকে অভিযান করে। জুলাই মাসে বন্দরনায়েক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আত্মঘাতী হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৫ ডিসেম্বর নির্বাচনে UNP–র রানিল উইকরেমাসিংঘে জয়ী হন। ১৯ ডিসেম্বর নরওয়ের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। LTTE ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।
২০০২	২২ ফেব্রুয়ারি শ্রীলংকা সরকার এবং LTTE এক স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এরপর আলোচনা চলতে থাকে। আগস্টে সরকার LTTE–র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে রাজি হয়। পাঁচদফা আলোচনার পর দু'পক্ষ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাধানে সম্মত হয় এবং LTTE আলাদা রাষ্ট্রের দাবি থেকে সরে আসে।
২০০৩	২১ এপ্রিল আলোচনা ভেঙে যায়। ৩১ অক্টোবর LTTE নিজস্ব শান্তি প্রস্তাব পেশ করে। এতে 'অন্তর্বর্তীকালীন স্বশাসন কর্তৃত্ব' চেয়ে উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকায় তাদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দাবি করা হয়। দক্ষিণে তাঁর নিজের দলে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী উইকরেমাসিংঘে জরুরি অবস্থা জারি করেন। তিনি JVP–র সঙ্গে মিলে নতুন জোট 'ইউনাইটেড পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্স' UPFA গঠন করেন।
২০০৪	৮ এপ্রিল নির্বাচনে জিতে UPFA–র মাহিন্দ রাজাপাকসে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। নির্বাচনের

	পর ত্রিঙ্কোমালির দক্ষিণের যুদ্ধে LTTE পিছু হটে। LTTE–র ইস্টার্ন কমান্ডার ভিনায়াগামুর্থি মুরলীথর ওরফে করুণা সহ অন্য বন্দীদের শাসক পার্টির সইদ আলি জাহির মৌলানা পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। করুণা ৫ হাজার ক্যাডার সহ LTTE ছেড়ে 'তামিলএলা মাক্কাল ভিদুথালাই পুলিকাল' TMVP গঠন করেন। ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সুনামির আঘাতে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং আরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।
২০০৫	১২ আগস্ট শ্রীলংকার বিদেশমন্ত্রী তামিল লক্ষণ কাদিরগামার LTTE–র হাতে নিহত হন।
২০০৬	পূর্ব ত্রিঙ্কোমালি জেলায় মাভিল আরু অঞ্চলের জলাধারের স্লুইস গেট বন্ধ করে দেওয়ায় ১৫০০০ গ্রামের ধানখেতে জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফের যুদ্ধ শুরু হয় ২১ জুলাই।
২০০৭	১১ জুলাই সামরিক বাহিনী থোপ্পিগালা দখল করে পূর্ব প্রদেশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব প্রদেশের ১০ হাজার পরিবারের ৩৫ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। ২৯ ডিসেম্বর ডিফেন্স সেক্রেটারি গোটাবায়া রাজাপাকসে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০২–এর চুক্তিবদ্ধ যুদ্ধবিরতি তুলে নেওয়ার দাবি করেন।
২ জানুয়ারি ২০০৮	সরকার যুদ্ধবিরতি সরকারিভাবে প্রত্যাহার করে। আমেরিকা, কানাডা, নরওয়ে এবং ভারত এই প্রত্যাহার নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
১০ জানুয়ারি	LTTE বিবৃতি দিয়ে জানায়, সরকারের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। তারা আন্তর্জাতিক সমাজকে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বলে। ১০ মার্চ বাত্তিকালোয়া জেলার ৯টি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আসনে TMVP জয়লাভ করে।
২৩ এপ্রিল	১৮৫ জন সৈন্যকে জাফনা থেকে কিলিনোচ্চি যাওয়ার পথে LTTE হত্যা করে।
৯ মে	আদামপান শহর দখল করে শ্রীলংকার সেনারা।
১০ মে	ইস্টার্ন প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনে TMVP শাসক UPFA–র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ায় এবং এতে UPFA জয়লাভ করে।
১৬ জুলাই	উত্তর–পশ্চিম উপকূলভাগের শহর ভিদাত্তালতিভু এবং মূল সী টাইগার ঘাঁটি সেনারা দখল করে।
২০ জুলাই	ইউপ্পাইক্কাদাভাই শহর দখল করে সেনারা।
২১ জুলাই	LTTE ঘোষণা করে যে তারা ২৮ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট কলম্বোতে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে একতরফা যুদ্ধবিরতি পালন করবে। সরকার LTTE–র ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে।
২ আগস্ট	মান্নার জেলায় ভেল্লানকুলাম শহরে LTTE–র শেষ শক্ত ঘাঁটির পতন হয়।
২ সেপ্টেম্বর	সেনাবাহিনী প্রচণ্ড সামরিক সংঘর্ষের মধ্যে মাল্লাভি শহর দখল করে।
৯ সেপ্টেম্বর	LTTE আচমকা ভাভুনিয়া বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করে।
১৫ সেপ্টেম্বর	কিলিনোচ্চির কাছে আক্কারায়ানকুলাম–এ প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়।
৩ অক্টোবর	রাষ্ট্রসংঘের ৫১টি ট্রাকের কনভয় ৬৫০ টন খাদ্য নিয়ে কিলিনোচ্চি জেলায় প্রবেশ করে। কিলিনোচ্চি শহরে কাউকে পাওয়া যায়নি।
১৭ অক্টোবর	সেনাবাহিনী নাচ্চিকুদা–র উত্তরে মান্নার–পুনেরিন রোডের সংযোগ কেটে দেয়। এর ফলে দু'লক্ষের বেশি গৃহহীন সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়।
২৯ অক্টোবর	পশ্চিম উপকূলে LTTE–র নাচ্চিকুদা ঘাঁটির পতন হয়।
১৫ নভেম্বর	সেনাবাহিনীর টাস্ক ফোর্স LTTE–র রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ঘাঁটি পুনেরিনে প্রবেশ করে।
১৭ নভেম্বর	সেনাবাহিনী মানকুলাম এবং আশপাশের এলাকা দখল করে।
৪ ডিসেম্বর	সেনাবাহিনী মুল্লাইতিভু–র ১০ কিমি দক্ষিণে আলামপিল–এ প্রবেশ করে।
১ জানুয়ারি ২০০৯	সেনাবাহিনী কিলিনোচ্চির উত্তরে পারানথান দখল করে।
২ জানুয়ারি	প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ রাজাপাকসে ঘোষণা করেন এক দশক ধরে LTTE–র প্রশাসনিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত কিলিনোচ্চি সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছে।
৮ জানুয়ারি	টাইগাররা জাফনা উপদ্বীপ ছেড়ে মুল্লাইতিভুর জঙ্গলে সরে যায়।
২৫ জানুয়ারি	সেনাবাহিনী LTTE–র শেষ ঘাঁটি মুল্লাইতিভু দখল করে।
৩ ফেব্রুয়ারি	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান, নরওয়ে এক যুক্ত বিবৃতিতে LTTE–কে অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে বলে।
৫ ফেব্রুয়ারি	সেনাবাহিনী চালাই–তে শেষ 'সী টাইগার বেস' দখল করে নেয়।
২০ ফেব্রুয়ারি	LTTE–র দুই বিমান কলম্বোতে আত্মঘাতী হানা দেয়। ২ জন নিহত এবং ৪৫ জন আহত হয়। বিমান দুটিকে গুলি করে নামানো হয়।
২৬ নার্চ	সামরিক বাহিনী জানায়, 'নো ফায়ার জোন'–এর বাইরে মাত্র ১ বর্গ কিমি অঞ্চলে LTTE–র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিন বছর আগে ১৫০০০ বর্গ কিমি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

৫ এপ্রিল	সেনাবাহিনী পুথুক্কুদিইরিপ্পু দখল করে LTTE–কে নাগরিকদের বসতি 'নো ফায়ার জোন'–এ ঠেলে নিয়ে যায়।
২০–২১ এপ্রিল	সেনাবাহিনী 'নো ফায়ার জোন'–এ প্রবেশ করে বহু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। তামিলরা দলবদ্ধভাবে পালিয়ে যেতে থাকে।
২২ এপ্রিল	LTTE–র মিডিয়া কো–অর্ডিনেটর ভেলেউথান থায়ানিথি এবং টপ ইন্টারপ্রেটার কুমার পঞ্চরত্নম সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।
মে	'ইউএন অফিস ফর দ্য কো–অর্ডিনেশন অফ হিউমেনিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স' জানায়, ১,৯৬,০০০ মানুষ পালিয়ে গেছে এবং উত্তর–পূর্বের উপকূলভাগের সংঘর্ষ–এলাকায় আরও ৫০,০০০ মানুষ আটকে রয়েছে। 'দ্য টাইমস' পত্রিকা জানায়, 'সেফ জোন'–এ ২০,০০০ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে।১৬ মে সেনাবাহিনী উপকূলভাগের শেষ যে অংশে LTTE আশ্রয় নিয়েছিল, তা দখল নেয়। প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ রাজাপাকসে বিজয় ঘোষণা করেন।
১৭ মে	LTTE–র চিফ অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস সেলভারাসা পাথমানাথান পরাজয় স্বীকার করে নেন।
১৮ মে	উত্তর–পূর্বাঞ্চলের এক ছোট্ট জঙ্গলে সকালে LTTE নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণকে হত্যা করা হয়।

এক ভারতীয় তামিলের চোখে
শ্রীলংকার তামিল সমস্যা

দি স্টেটসম্যান প্রিন্ট জার্নালিজম স্কুলের ডিরেক্টর সাম রাজাপ্পা (সংক্ষেপে সা.রা.)–র সঙ্গে জিতেন নন্দীর (মন্থন) সাক্ষাৎকার ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করে ছাপানো হল।

মন্থন : শ্রীলংকায় সিংহলা ও তামিলদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে সংঘাত চলে আসছে, তার কি এবার অবসান হল?

সাম রাজাপ্পা : আমি মনে করি না যে সংঘাতের অবসান হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সংঘাত শেষ হয়নি।

মন্থন : তাহলে এই সংঘাত অর্থাৎ 'তামিল ইলম' প্রশ্নের কী সমাধান আপনি মনে করেন?

সা.রা. : মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্যাটা বেশ জটিল, কিন্তু এর সমাধান খুবই সহজ। তবে এই সহজ সমাধানটাকে কেউ গ্রহণ করবে না। যদি শ্রীলংকা একটা ঐক্যবদ্ধ দেশ থাকতে চায়, তাহলে তার একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দরকার। কারণ শ্রীলংকায় বরাবর দুটো জাতি ছিল, একটা তামিল, অন্যটা সিংহলা।

মন্থন : কেন শ্রীলংকায় তো অন্যান্য কমিউনিটির কথাও শুনেছি —

সা.রা. : অবশ্যই। তবে ওখানে একটা তামিল রাজ্য এবং একটা সিংহলা রাজ্য ছিল। যতটা নথিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়, মোটামুটি ছ'হাজার বছর পিছনে যাওয়া যেতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল, আবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও ছিল। কিন্তু এই দ্বীপে বরাবর একটা তামিল এবং সিংহলা সমাজ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন শুরু হল, জাফনায় একটা তামিল রাজ্য ছিল। প্রথমদিকে ইউরোপীয়দের ছোটো ছোটো উপনিবেশ ছিল, তারা সবটাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেনি। কেবল যখন ব্রিটিশরা উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করল এবং পর্তুগিজ ও ডাচেদের তাড়িয়ে দিল, তখন তাদের দুটো আলাদা সরকারের পরিবর্তে একটা ঐক্যবদ্ধ সরকারের প্রয়োজন হল। এমনকী, যখন ব্রিটিশরা শ্রীলংকা দখল করল, তখন সিংহলা রাজ্য শাসন করছিলেন একজন তামিল রাজা। রাজা ইলারা ... আবার অতীতে উল্টোটাও দেখা গেছে। আমরা জানি ইতিহাসে এমনটা ঘটেই থাকে। কিন্তু সবসময়ই শ্রীলংকা দ্বীপে তামিল ও সিংহলা নামক দুটো আলাদা জাতির অস্তিত্ব ছিল।

১৮৩০ সালে ব্রিটিশরা যখন পর্তুগিজ ও ডাচেদের তাড়িয়ে পুরো দ্বীপের দখল নিল, তারা শাসনকার্য চালানোর জন্য সবটাকে ঐক্যবদ্ধ করে কলম্বোতে রাজধানী স্থাপন করল। ১৯৪৮–এ যখন ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তারা কিন্তু তামিল ও সিংহলা দুটো সত্ত্বার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করল না। সেটাই করা উচিত ছিল, কেননা তারা যখন এসেছিল, তখন দ্বীপে দুটো আলাদা রাজ্য ছিল। এটাই ছিল ব্রিটিশের উপনিবেশবাদী মানসিকতা। তামিলদের মধ্যেও যারা অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেছিল, তারা ছিল ব্রিটিশদের থেকেও বেশি ব্রিটিশ। যেমন আমরা বাংলাতেও দেখেছি। সিংহলারা মজা করে এদের বলত বাদামি সাহেব। সিংহলা এবং তামিলদের মধ্যে একটা ছোট্ট এলিট অংশ মনে করত, আমরাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করব। তারা ব্রিটিশদের বলতে পারত, তোমরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করছ, তখন সিংহলা ও তামিলদের প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দাও। সেটা ওরা করল না। ওটাই ছিল শ্রীলংকায় তামিল সমস্যার সূত্রপাত।

এই সমস্যার শুরু হল একটা কমিউনিটির হাতে — সিংহলা বৌদ্ধ কমিউনিটির হাতে — ক্ষমতা অর্পণের মধ্য দিয়ে। সিংহলা বৌদ্ধ এলিটরা ব্রিটিশ আমলে ছিল সকলে ক্রিশ্চান, এদের নাম শুনলেই বোঝা যায়। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব বৌদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং ধর্ম ছিল এদের কাছে সুবিধা আদায়ের উপায়, কোন প্রত্যয় বা বিশ্বাসের বস্তু নয়। ব্রিটিশ আমলে সিংহলা ও তামিল উভয় এলিটদের মধ্যে ফ্যাশান ছিল শাসক এলিটদের মতো পরিচিত হওয়া।

মন্থন : তামিল রাজনীতিবিদেরা কি সেসময় ক্ষমতার দাবি করেছিল?

সা.রা. : তাদের করা উচিত ছিল। একজন তামিল রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, সংবিধানে ৫০% আসন তামিলদের এবং ৫০% সিংহলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত, যাতে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে। কিন্তু এটা কোন কার্যকর প্রস্তাব ছিল না। কারণ সেসময় তামিলরা ছিল সংখ্যায় ৩০%, অন্য কমিউনিটি বাদ দিয়ে সিংহলারা ছিল প্রায় ৭০%। তাহলে কীভাবে তামিলরা ৫০% আসন পাবে? সেখানে তামিলরা ৩০% এবং সিংহলারা ৭০% পেলেও সিংহলারা সবসময় সংখ্যাগুরু থেকে যাবে। সেটাও কোন কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না। ব্রিটিশরা অবশ্য তাতে একমতও

হয়নি। সেই সময় তামিল নেতৃত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না এবং নিজেদের দাবি তুলে ধরার মতো যথেষ্ট জাতীয়মনস্ক ছিল না। তামিল এলিটরা শাসক ব্রিটিশ এলিটদের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিল। তারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবত না।

ব্রিটিশ সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্য — তামিল, এমনকী মুসলমানদের জন্য — কিছু রক্ষাকবচ ছিল। ১৯৪৮–এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে। এখন তৃতীয় সংবিধান চলছে। ওখানে আমাদের মতো সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার তেমন গুরুত্ব নেই। আমাদের দেশে যেমন ১৯৫১ সালে সংবিধান রচনা হয়েছে, তার বহু সংশোধনী এসেছে, কিন্তু সেই সংবিধানকে আমাদের দেশের পলিটিকাল ক্লাস একটা পবিত্র দলিল মনে করে। সিংহলা জনসংখ্যা ৭০%, তারা সবসময় সংখ্যাগুরু, সুতরাং সংবিধান পরিবর্তন করা তাদের কাছে কঠিন কিছু নয়। প্রথম যেটা তারা করল, ১০ লক্ষ মানুষের — যাদের ইন্ডিয়ান তামিল বলা হয় — ভোটাধিকার রদ করল। কেন এদের ইন্ডিয়ান তামিল বলা হয়? কারণ ১৮৩০ সাল থেকে এদের এখানে আনা হয়েছিল ব্রিটিশ প্ল্যান্টেশনের কাজে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্নাটক থেকে, কিছু কেরালা থেকে এরা প্ল্যান্টেশনের কাজে ওখানে গিয়েছিল। এরা ওখানে বসবাস করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে। কারণ কাজটা ধারাবাহিক। এদের অবস্থাও ভালো। এরা ভারতে ফিরে আসার কথা ভাবেনি। ওখানেই থিতু হয়েছে। এদেরই ইন্ডিয়ান তামিল বা প্ল্যান্টেশন তামিল বলা হয়, ওখানকার ছ'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাসকারী দেশীয় তামিলদের থেকে আলাদা করার জন্য। এই দেশীয় তামিলরা কিন্তু ইন্ডিয়ান তামিলদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপকে বিরোধিতা করল না। কারণ এদেরকে ওরা কুলি বলে মনে করত। এই কুলিরা অবশ্য অনেকেই লেখাপড়া শিখেছিল, ব্যবসা–বাণিজ্যও করেছে, সবাই আর কুলি থাকেনি। এদের মধ্যে ধনী মানুষজনও আছে। ধনী ব্যবসায়ী, কেউ কেউ কলম্বোতে বাস করে — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ইত্যাদি।

নেহরু সেই সময় ঠিক করলেন, এরা শ্রীলংকার 'ন্যাচারাল বর্ন', ভারত এদের গ্রহণ করবে না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ভারতে আসতে পারে, ভারত থেকেও কেউ যেতে পারে। কিন্তু একটা সমষ্টিগত জনগোষ্ঠী হিসেবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। নেহরু যতদিন বেঁচে ছিলেন এটা হতে পারেনি। কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তাঁর বিদেশ সচিব ছিলেন এল.কে.ঝা। তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বোঝালেন, এব্যাপারে একটা সমঝোতা করতে হবে। দুই–তৃতীয়াংশ ইন্ডিয়ান তামিলকে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এই শর্তে, যদি এক–তৃতীয়াংশকে শ্রীলংকার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। কলম্বোর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হল। কিন্তু যারা স্বচ্ছল, তারা ওখান থেকে কেউই আসতে চাইল না। ফলে প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কাররা আসতে বাধ্য হল। তারা এখানে বেকার হয়ে রইল। এখানে প্ল্যান্টেশনেও যথেষ্ট স্থানীয় ওয়ার্কার রয়েছে। এদের ৮০০০ টাকার মতো একটা রিসেট্‌লমেন্ট মানি দেওয়া হয়েছিল। এরা সেই টাকা খরচ করে ফেলল এবং তারপর নিঃস্ব হয়ে গেল।

এটা ছিল আর একটা অধ্যায়। কিন্তু কেন শ্রীলংকা এদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে চায়নি? কারণ স্বাধীনতার পর যে নির্বাচন সেখানে হয়েছিল, তাতে এই ইন্ডিয়ান তামিলরা সকলেই তামিল প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিল। ফলে পার্লামেন্টে একটা বড়ো তামিল প্রতিনিধিত্ব হতে পেরেছিল। সিংহলা রাজনীতিবিদেরা সেটা কমাতে চেয়েছিল। ভারত মুর্খের মতো তাদের ফাঁদে পা দিল।

এরপর ১৯৫৬ সালে বন্দরনায়েক পার্লামেন্টে 'সিংহলা ওনলি' বিল আনলেন। এতে সিংহলাকে একমাত্র সরকারি ভাষা করতে চাওয়া হল। যখন ব্রিটিশরা শ্রীলংকাকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তখন তারা ইংরেজিকে একমাত্র সরকারি ভাষা করেছিল। শিক্ষিত তামিল ও সিংহলারা ইংরেজি বুঝত, ফলে তখন কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এবার সমস্যা তৈরি হল। একটা উদাহরণ দিই। জাফনা জেলায় একজনও সিংহলা বাসিন্দা নেই। এটা ১০০ শতাংশ তামিল বসতি অঞ্চল। প্রসঙ্গত, শ্রীলংকার মুসলমানেরাও সকলেই তামিল। যদিও তারা নিজেদের 'মুর' হিসেবে চিহ্নিত করে। আমি নিজে দেখেছি, ওখানকার মুসলমান সমাজ তাদের সমস্ত ধর্মীয় আচার তামিল ভাষায় পালন করে। এমনকী, তামিলনাড়ুতেও মুসলমানেরা ধর্মাচরণে উর্দু এবং আরবি ব্যবহার করে। অতএব ওখানে তারা অন্যান্য তামিলদের মতো — সে ক্রিশ্চান বা হিন্দু যাই হোক — ততটাই তামিল। সিংহলারা এদের 'মুর' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তামিলদের মধ্যে এদের গোনা হয় না। ভাষার প্রসঙ্গটায় ফিরে আসি। কলম্বো থেকে কেউ একজন জাফনায় একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চায়। সেসময় ইন্টারনেট আসেনি। একজন হয়তো কলম্বোতে একটা কলেজে ভর্তি হতে চায়। যদি সে টেলিগ্রামটা ইংরেজিতেও লেখে, টেলিগ্রাফ অফিসে অর্ডার ছিল, ওই টেলিগ্রামটা সিংহলাতে তর্জমা করে পাঠানো হবে। এখন জাফনায় কেউই সিংহলা পড়তে পারে না। সুতরাং একটা চাকরি, কলেজে ভর্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এরকম একটা জরুরি বার্তা বোঝার উপায় ছিল না। সেই সময় এক দায়িত্বশীল সিভিল সার্ভেন্টকে জাফনায় ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর বা গভর্নমেন্ট এজেন্ট হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সরকারকে জানালেন, এইভাবে অর্ডার কার্যকর করতে গেলে খুবই সমস্যা হচ্ছে। যদি এই ভাষানীতি চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে একটা বিদ্রোহ দেখা দেবে। সরকার প্রত্যুত্তরে জানালো, আমরা তামিল এলাকাগুলো সৈন্য দিয়ে ঘিরে দেব। সেটা ছিল ১৯৬০–এর দশক। ওরা তামিলদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখতে বদ্ধ পরিকর ছিল।

এরপর যেটা আরোপিত হল, সেটাকে ওরা বলত 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন'। একজন তামিল যদি কলেজে ভর্তি হতে চাইত, তাকে অন্য সিংহলা প্রার্থীর তুলনায় ১৫% নম্বর বেশি পেতে হবে। শ্রীলংকায় কলেজের সংখ্যা ছিল কম। পেশাগত কলেজের সংখ্যা ছিল আরও কম। অতএব নতুন প্রজন্মের পক্ষে — যারা ১৯৫০–এর পরে জন্মেছে — হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে ঢোকা তাদের অসম্ভব হয়ে পড়ল। তামিলরা উচ্চশিক্ষায় গুরুত্ব দিত। ব্রিটিশরা যখন চলে গেল, সিভিল সার্ভিসে ৯০% ছিল তামিল। এবার নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে পড়তে গেল, তারা জানলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদের উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ। অতএব সরকারি চাকরিতেও তারা যেতে পারবে না। ফলে তাদের মধ্যে এল হতাশা। তারা তামিল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রশ্ন করল, যদি এই অবস্থাকে শোধরাতে হয় তাহলে কি তামিলদের আলাদা একটা রাষ্ট্র দরকার নয়? সেই সময় প্রধান তামিল দল ছিল 'ফেডারেল পার্টি'। তারা নিজেদের ওই নাম নিয়েছিল, কারণ তারা মনে করত কলম্বোতে একটা ফেডারেল গভর্নমেন্ট দরকার। এই দলের নেতা ছিলেন চেলভানায়াগাম, এক গান্ধীবাদী। তিনি শাসক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে একের পর এক আলোচনা করেন এবং শাসকদলের সঙ্গে দুটো চুক্তি সম্পন্ন করেন — বন্দরনায়েক–চেলভানায়াগাম চুক্তি ও সেনানায়েক–চেলভানায়াগাম চুক্তি। সই করেও সেই চুক্তি মানা হয়নি।

১৯৭৭ সালে এসে তামিল যুবকেরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের ফেডারেল পার্টিকে বদলে 'তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট' TULF গঠন করতে বাধ্য করল। এই দলের লক্ষ্য স্থির হল আলাদা তামিল রাষ্ট্র গঠন। কারণ শ্রীলংকার সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেনে নেয়নি। যতবার তারা কিছু মেনেছে, ততবার সেখান থেকে পিছু হটেছে। এরা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সমস্ত তামিল আসনে জয়লাভ করল। চেলভানায়াগাম মারা গেলেন, অমৃতলিঙ্গম নেতৃত্বে এলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না কীভাবে এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা হবে। এখান থেকেই জঙ্গি আন্দোলনের বীজ রোপিত হল। তামিল যুবকেরা অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের কাছে মনে হল, এটাই আমাদের ক্ষোভের সমাধানের একমাত্র রাস্তা। এছাড়া সিংহলাদের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার নিয়ে বাস করার অন্য উপায় নেই। আমাদের তামিলদের নিজস্ব রাষ্ট্র দরকার। পাঁচটি জেলা নিয়ে উত্তরের প্রদেশ এবং তিনটি জেলা নিয়ে পূর্বের প্রদেশ — এই দুটো প্রদেশ নিয়ে গড়ে উঠবে 'তামিল ইলম'। তামিল ভাষায় ইলম মানে হল লংকা। অনেকে মনে করে এটা তামিল কিছু ব্যাপার, মোটেই তা নয়। ইলম মানে তো সমগ্র শ্রীলংকা। এরা চাইছে দুটো প্রদেশ নিয়ে তামিল ইলম, যেমন থাকবে সিংহলা ইলম।

এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ইন্দিরা গান্ধী বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে সমস্যাটা অনেক ভালো বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জঙ্গিদের উৎসাহ দিলেন এবং ভারতের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানতেন সিংহলারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাধান মানবে না। তিনি নিজে তামিল ইলমে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি মনে করতেন, একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের চাপেই সিংহলারা তামিলদের ন্যায্য দাবিকে স্বীকৃতি দেবে। এই প্রশিক্ষণ মূলত তামিলনাড়ুতে হত। কিন্তু দেরাদুন এবং অন্যান্য সামরিক কেন্দ্রেও এই প্রশিক্ষণ হত। এটা এমন এক গোপন কার্যকলাপ যা সকলেই জানত। শ্রীলংকায় একটা বাংলাদেশ ঘটানোর পরিকল্পনা তাঁর ছিল। এই বাংলাদেশ ধরনের অপারেশন করার জন্য একটা নতুন এয়ারবেস তৈরি করা হয়েছিল রামনাথপুরম জেলায়। এয়ারফোর্স, নেভি এবং আর্মিকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। অবশ্যই শ্রীলংকার তামিল জঙ্গিদের সামনে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা RAW এই অপারেশনে যুক্ত ছিল। ওইসময় RAW-তে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা CIA-র অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ওয়াশিংটন পুরো পরিকল্পনা তৎকালীন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জে.আর.জয়বর্ধনের কাছে ফাঁস করে দেয়। অপারেশন বানচাল হয়ে যায়। এটা ছিল ১৯৮৪ সালের গোড়ার ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধী পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় বিষয়টাকে স্থগিত রাখেন। এরপর অমৃতসরে ঘটল অপারেশন ব্লু স্টার এবং ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হল।

এরপর রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তিনি এসবের কিছু জানতেন না। সেসময় তাঁর বিদেশ সচিব ছিলেন একজন তামিল। তাঁকে অকস্মাৎ সরিয়ে দিয়ে ভান্ডারী নামে আর একজনকে সেই পদে নিয়ে আসা হল। তিনি যখন বিদেশ সচিব হিসেবে প্রথম কলম্বোতে গেলেন, তাঁকে দারুণ আদরযত্ন করা হল সেখানে। শোনা গেছে, তাঁর স্ত্রীকে একটা অতি মূল্যবান হিরের নেকলেসও উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি রাজীব গান্ধীকে বোঝান যে তামিল যুবকেরা সন্ত্রাসবাদী, তাদের মোটেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাঁর চেষ্টাতেই ১৯৮৭-তে রাজীব গান্ধী ভারত-শ্রীলংকা চুক্তিতে সাক্ষর করলেন। সেই চুক্তিও কিন্তু আজ পর্যন্ত মানা হয়নি। এতে বলা হয়েছিল উত্তর ও পূর্বের দুই প্রদেশকে যুক্ত করে একটা প্রদেশ হিসেবে এক স্বশাসিত তামিল অঞ্চল গঠন করা হবে। এই চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য ভারত থেকে একটা 'পিস কিপিং ফোর্স' IPKF পাঠানো হবে। এই ভারতীয় শান্তি রক্ষা বাহিনী IPKF ওখানে গিয়ে তামিলদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করল।

এখানে অন্য কিছুও ঘটেছে, যেটা আমাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় স্বাধীনতার সময় থেকেই এই মন্ত্রক কেরলিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা বলা যেতে পারে ব্রিটিশ ট্রাডিশন। প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন কেরালার এম.আর.পিল্লাই। আজও আমাদের বিদেশ মন্ত্রকের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার একজন কেরলি, বিদেশ সচিব কেরলি, প্রধানমন্ত্রীর সচিব কেরলি, ক্যাবিনেট সচিব কেরলি। কেরলিদের তামিলদের প্রতি এক ধরনের সহজাত অপছন্দ রয়েছে। এই মানুষেরাই আমাদের বিদেশনীতি তৈরি করেন।

এইভাবে LTTE—কে খতম করার পরিকল্পনায় ভারত সরাসরি মদত করেছে. কিন্তু LTTE—কে শেষ করে কি তামিল সমস্যার সমাধান হয়েছে? এটা এখন আরও গুরুতর মোড় নিতে পারে। হয়ত তা যুদ্ধের দিকে না-ও যেতে পারে, কিন্তু অন্য কূটনৈতিক পথে তা এগোতে পারে। আমেরিকা শ্রীলংকার প্রতিরক্ষা-প্রধান সারাথ ফনসেকার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগ আনছে। ফনসেকা আমেরিকার গ্রিন কার্ড হোল্ডার। তিনি গত সপ্তাহে তাঁর গ্রিন কার্ড নবীকরণ করতে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে একটা কমিশনের সামনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ডাকা হয়। শ্রীলঙ্কার সরকার অবৈধভাবে তাঁকে আমেরিকা থেকে বার করে নিয়ে আসে। কিন্তু তাঁর গ্রিন কার্ড এখন বিপন্ন। তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছেন। প্রতিরক্ষা সচিব গোটোবাইয়া রাজাপাকসে একজন আমেরিকার নাগরিক। তিনি শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসের ভাই। আমেরিকার নাগরিক হয়ে কী করে তিনি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকেন, কেউ জিজ্ঞাসা করছে না।

মন্থন : এটা বোঝা যাচ্ছে, সিংহলা ও তামিল সংঘাত এবং রাজনীতি নতুন কোন পথে চলবে। ইতিমধ্যে ত্রিঙ্কোমালিতে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' SEZ তৈরি হয়েছে, বাত্তিকালোয়া, আমপারা এবং উত্তরের কিলিনোচ্চি ও মুল্লাইথিভুতেও হওয়ার পরিকল্পনা চলছে। বহুজাতিক কর্পোরেটদের হাতে এলাকাগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন যে আড়াই লক্ষ তামিল — পরিবার, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমেত অমানুষিক পরিবেশে আশ্রয় শিবিরে রয়েছে — একরকম বন্দীই বলা যেতে পারে —

সা.রা. : ডিমাইনিং-এর (LTTE-র পুঁতে যাওয়া মাইন নষ্ট করার) যুক্তিতে এদের আটক করে রাখা হয়েছে। অবশ্য বহু তামিল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং অন্য দেশে পালিয়ে গেছে। তামিলনাড়ুর শিবিরেও রয়েছে দেড় লক্ষ শ্রীলংকার তামিল। তারা সেখানে কোন কাজে যুক্ত হতে পারে না। শিবিরের অবস্থাও খুবই দুঃসহ।

মন্থন : সিংহলা ও তামিল সমাজ কি আলাদা আলাদা 'রেস' — আর্য ও দ্রাবিড় জাতি থেকে এসেছে?

সা.রা. : এটা ব্রিটিশদের তৈরি করে যাওয়া একটা অতিকথা। কোন নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বলা হয়েছে, সিংহলারা এসেছে 'ইজাভা' নামক এক কমিউনিটি থেকে। এরা অতীতে তালগাছ থেকে তাড়ি তৈরি করত। ...

মন্থন : কিন্তু ভাষা?

সা.রা. : সেটা আলাদা আলাদা, সিংহলা এবং তামিল। বর্ণমালাও আলাদা আলাদা।

মন্থন : জাত ব্যবস্থা (কাস্ট সিস্টেম)?

সা.রা. : শ্রীলংকার মানুষ খুবই জাত সচেতন। ভারতের জাত ব্যবস্থা যদি খারাপ হয়, তাহলে শ্রীলংকার তার থেকেও খারাপ। কাঠামোটা সিংহলা

এবং তামিলদের ক্ষেত্রে একই রকম। তবে তামিলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাত নেই। চাষি হল সর্বোচ্চ জাত। তামিলদের 'ভেলালা' এবং সিংহলাদের 'গোইগামা' হল চাষি। তবে ওখানে সিংহলা এবং তামিল উভয়ের মধ্যেই বহু বিভাজন অর্থাৎ উপজাত (সাবকাস্ট) রয়েছে। পূর্বতন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ধোবি (ওয়াশারম্যান) জাতের। জয়বর্ধনে ছিলেন গোইগামা, উঁচু জাতের। যখন জয়বর্ধনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, প্রেমাদাসা ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর বাসভবনে প্রেমাদাসাকে এক কাপ চা-ও খাওয়াতেন না, কারণ প্রেমাদাসা নিচু জাতের।

মন্থন : যদি শ্রীলংকাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যেতে হয়, কীভাবে তা সম্ভব?

সা.রা. : ইন্দো-শ্রীলংকা এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে শ্রীলংকা তার সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী এনেছিল। পার্লামেন্টে তা পাশ হয়েছিল। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুযোগ ছিল। কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি।

সমাজ-বিবর্তনের পথ ধরে সিংহলা-তামিল

জিতেন নন্দী

১৯ মে এলটিটিই-র শেষ শক্ত-ঘাঁটি মুল্লাইথিভু-তে ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের হত্যার মধ্য দিয়ে তিনদশক ব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসান হল। তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করেন একদা তাঁরই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী করুণা। মাত্র দু'মাস আগেই মাহিন্দ রাজাপাকসে-র সরকারের 'জাতীয় সংহতি মন্ত্রী' হিসেবে করুণা শপথ গ্রহণ করেন। প্রতিবেশী দেশের এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আমাদের সকলকেই নাড়া দেয়। মানচিত্রে শ্রীলংকাদ্বীপ যেন আমাদেরই 'এক ফোঁটা চোখের জল'। এই চোখের জলের ইতিহাসের কোথায় লুকিয়ে রয়েছে চলমান জটিল সংঘাতের বীজ? আসুন আমরা অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করি।

দ্বীপ-সমাজের মূল ক্ষেত্র হল গ্রাম। গত তিনদশকে শহর হয়ত খুবই কদর্যভাবে সংঘাতকে বারবার উগরে দিয়েছে। কিন্তু সেই সংঘর্ষের শিকড় প্রোথিত ছিল গ্রামসমাজে, এখানকার মাটির গভীরে। প্রাচীনকাল থেকে এই দ্বীপের সমাজ কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে লালন করে এসেছে। পরিবর্তন এসেছে একের পর এক। কিন্তু সমাজের মৌলিক গড়নটা ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

২

সব ঐতিহ্যগত বা দেশজ বৈশিষ্ট্যেরই ভালো মন্দ দুটো চেহারা থাকে। মন্দের চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবে শ্রীলংকার সমাজে চোখে পড়ে — এখানকার জাত-বৈষম্য।[১] জাতের ব্যাপারটাতে শ্রীলংকার কাছে আমাদেরও হার মানতে হয়। সিংহলা ও তামিল সমাজের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক, ওই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের অদ্ভুত মিল। উত্তর শ্রীলংকায় তামিল-অধ্যুষিত জাফনা উপদ্বীপে কমপক্ষে ৪৮টি জাতের উপস্থিতি রয়েছে। অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে একটাই মাত্র জাতের মানুষ বাস করে। আবার বহু জাতের বসতিপূর্ণ গ্রামও রয়েছে। এমন গ্রাম রয়েছে যেখানে ১৭টি পর্যন্ত জাতের উপস্থিতি রয়েছে। আবার প্রত্যেক জাতের মধ্যে কতগুলো নামহীন উপজাত (sub-caste) রয়েছে। তামিল ভাষায় এদের বলা হয় 'সোন্দাকারা' অর্থাৎ স্বজাতি। এই স্বজাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। এরা অনেকসময় এক গ্রামে বা গ্রামের একই অংশে বসবাস করে, আবার কোনসময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও ছড়িয়ে থাকে। জাফনাতে তামিলদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জাত হল 'ভেল্লালা'। পেশাগতভাবে এরা চাষি। কিন্তু ভেল্লালার মধ্যে আবার বহু নামহীন উপজাত রয়েছে। এদের কথাবার্তার ভঙ্গি বা উচ্চারণ, আর্থিক সঙ্গতি, ক্ষমতা এবং অবশ্যই বংশগত মর্যাদা আলাদা আলাদা।

সিংহলা সমাজেও কিন্তু সবচেয়ে উঁচু জাত হল চাষি, ওদের ভাষায় 'গোইগামা'। তামিল সমাজের সঙ্গে মিল শুধু এটুকুই নয়। প্রত্যেক জাতের ভিতর উপজাতের অস্তিত্ব বা স্বজাতের অস্তিত্ব এখানেও একইরকম রয়েছে। সিংহলা ভাষায় 'ভারিগা' বলে একটা শব্দ রয়েছে। আক্ষরিক অর্থে ভ্যারাইটি, রকম বা বর্গ হতে পারে। কিন্তু সিংহলা ধারণায় ভারিগার বৈশিষ্ট্য হল এর বৈবাহিক সম্পর্কের সামাজিক অনুমোদন। অন্য ভারিগার

[১] **পর্তুগিজরা যখন দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক আকারে বাণিজ্য করতে শুরু করে, তারা দেখতে পায় এই অঞ্চলের সমাজগুলির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মৌলিক কিছু তফাত রয়েছে। ভারতে ও শ্রীলংকায় এমন বহু সমাজ-গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের একের অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না, একে অপরের সঙ্গে মর্যাদাগত উঁচু-নিচু সামাজিক সম্পর্কে যুক্ত রয়েছে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর আলাদা বহুসংখ্যক আচার-আচরণ নির্দিষ্ট রয়েছে। পর্তুগিজরা এই গোষ্ঠীগুলিকে বলত কাস্টা, সেখান থেকে ইংরেজিতে আসে কাস্ট (caste) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এদের বলা হয় জাতি।**

সদস্যদের সঙ্গে এক ভারিগার বৈবাহিক সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদিও এর ব্যতিক্রম অবশ্যই ঘটে থাকে।

ই.আর.লিচ নামে এক নৃবিজ্ঞানী ১৯৫০–এর দশকে পুল এলিয়া গ্রামে জমির ভোগদখল ও জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিলেন। এতে দেখা যাচ্ছে, পুল এলিয়ার সিংহলা গ্রামবাসীরা ভারিগা শব্দটাকে বলে ভারিগে। ওদের কাছে তামিল (একটা ভাষাগত বিভাগ) ভারিগে, মুসলমান বা 'মারাক্কাল' (একটা ধর্মীয় বিভাগ) ভারিগে, সামাজিক বিভাগের মধ্যে ধোপা ও ড্রামবাদকও ভারিগে, আদিবাসী (একটি সাংস্কৃতিক–বর্ণগত বিভাগ) 'ভান্ডা' জনসমাজও ভারিগে, আবার একই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারাও ভারিগে। পুল এলিয়ার বাসিন্দারা হল গোইগামা (চাষি) জাতের এক বিশেষ ভারিগে। তাদের উপজাতগত আলাদা নাম নেই। নিজেদের পরিচয় দিতে বলে 'আমাদের ভারিগে' অর্থাৎ স্বজাতি। অন্য প্রায় ২৫টি গ্রামে এদের স্বজাতি ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। এরা নিজেদের বৌদ্ধ বলে মনে করে। প্রতিবেশী গ্রামের তামিল (হিন্দু ও মুসলমান) গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্ষীণ থাকার জন্য গর্ব অনুভব করে।

এক অর্থে ভারিগা একটা উপজাত। এমনকী গোইগামা (চাষি) জাতের অন্য ভারিগার ছেলের সঙ্গে পুল এলিয়ার মেয়েদের যৌন সম্পর্ক পাপ। যদিও পুল এলিয়ার কাজেকর্মে অন্য সিংহলারা অংশ নেয় এবং বিভিন্ন অ–গোইগামা সিংহলারা নিয়মিত পুল এলিয়ার মাঠে খেতমজুরের কাজ করে।

পুল এলিয়ার গোইগামা ভারিগার মানুষ মনে করে তারা গোইগামার মধ্যেও মর্যাদার দিক থেকে উঁচু। কেন? কারণ, প্রাচীনকালে এরা নাকি অনুরাধাপুরার এক গুরুত্বপূর্ণ সমাধিস্থলে উৎসবের সময় জলপদ্ম সরবরাহ করত। পুল এলিয়া শব্দের অর্থ হল ফুলে ভরা খোলা জায়গা। পাশের একটি গ্রামের নাম তুলাবেলিয়া — এখানে পুল এলিয়া থেকে ফুল নিয়ে গিয়ে ওজন করা হত।

৩

শ্রীলংকার এই বিশেষ জাত ব্যবস্থার কীভাবে উৎপত্তি হয়েছিল? এই প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যায় এখানকার প্রাচীন পালিগ্রন্থ, শিলালিপি এবং অন্যান্য প্রত্ন–সামগ্রী থেকে। যদিও ঔপনিবেশিক আমল থেকে এই পুরাকীর্তি ও প্রাচীন ইতিহাসকে সিংহলা ও তামিল শিক্ষিত সমাজ নিজেদের আত্মপরিচয়ের স্বার্থে নিজস্ব কায়দায় ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা করেছে বারবার। তবু সমস্ত তর্ক নিরপেক্ষভাবেই জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে এই দ্বীপের একটা ধারাবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, এই দ্বীপে মানুষের বাস শুরু হয়েছিল প্রায় চৌত্রিশ হাজার বছর আগে। একটা বিবরণে পাওয়া যায়, প্রথম যে আর্য অভিবাসীরা ভারত থেকে এসে শ্রীলংকার মালবাতু ওয়া এবং অন্যান্য নদীর তীরে বসতি গড়ে তোলে, তাদের কাছে জলসঞ্চয় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এমনও হতে পারে, যারা এই দ্বীপে ধানচাষের প্রচলন করেছিল, তাদের সামান্য হলেও জলসংরক্ষণের জ্ঞান ছিল। কেননা ধানচাষের ক্ষেত্রে জলের সরবরাহকে যথেষ্ট কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়।

মিশর, মেসোপটেমিয়া বা উত্তর ভারতের মতো এত পুরনো জলবাহী সভ্যতা (hydraulic civilisation) না হলেও শ্রীলংকার জলবাহী সভ্যতাও প্রাচীন। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগেই এখানে একটা জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সিংহলা ছিল এই দ্বীপের উত্তরে শুষ্ক অঞ্চলে (dry zone), যাকে এখন বলা হয় উত্তর–মধ্য প্রদেশ। বছরে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর ইঞ্চি গড় বৃষ্টিপাত হলেও এখানে সেচ ছাড়া নিয়মিত চাষ করা অসম্ভব। এখানে স্বাভাবিক জলস্তর খুব নিচু। এখানকার মাটি উর্বর নয়, আবার একেবারে ঊষরও নয়। এই চাষের জন্য বাইরে থেকে জল আনা হত না। বরং বৃষ্টির জলকে স্থানীয়ভাবে ধরে রাখা হত সারাবছর ব্যবহারের জন্য। এই স্থানীয় সেচ ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকেই এখানে পঞ্চাশ বা তারও কম পরিবার নিয়ে ছোটো ছোটো গ্রামের পত্তন হয়েছিল। জীবিকার জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের তৈরি জলাধার থেকে জলসেচের মাধ্যমে ধানচাষ করত। প্রাচীনকালে কোন স্বাভাবিক জলের ধারা বরাবর আড়াআড়িভাবে একটা মাটির দেওয়াল তুলে দেওয়া হত এবং তার পিছনে জলটা ধরে রাখা হত। এই জলাধারগুলো যত না গভীর হত, তার চেয়ে লম্বা হত অনেক। গ্রাম্য জলাধার নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ গ্রামের সাধারণ মানুষই করত। শোনা যায়, এক বিশেষ উপজাতের তামিল শ্রমিক 'কুলানকাট্টি'–রা বংশানুক্রমিকভাবে মেরামত ও নতুন জলাধার তৈরির কাজ করত। তবে এই কাজ গ্রামবাসীরা সরাসরি ঠিক করে নিত, রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা ছিল না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীন গ্রাম ও তার চাষকে ঘিরে, বিশেষত জলের ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে একটা সমাজ গড়ে উঠেছে। চাষকে কেন্দ্র করে অন্য পেশার ভিত্তিতে সামাজিক বিভাগ তৈরি হয়েছে।

এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানীয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে সর্বত্র এক বৃহদায়তন সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন অনুরাধাপুরা, পোল্লোনারুয়া ইত্যাদি রাজ্যকে ঘিরে উন্নত প্রযুক্তির জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ৯০ ফুট উঁচু এবং ৯ মাইল লম্বা এই জলাধারগুলোর ভিতরে ইটের গাঁথনি এবং উন্নত স্থাপত্য লক্ষ্য করা গেছে। এগুলোতে ভাল্‌ভ পিট, স্লুইস সহ উন্নত জল–নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রাচীন রাজাদের অনেকেই ছিলেন যত না যোদ্ধা, তার চেয়ে বেশি সেচকার্যে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ। এঁদের মধ্যে একজন, পরাক্রমবাহু (প্রথম) পোল্লোনারুয়াতে ৩টি বিশাল জলাধার সহ ১৪৭০টি নতুন জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁর নির্মিত কৃত্রিম হ্রদ 'পরাক্রম সমুদ্র' হিসেবে খ্যাত।

রাজ্যগুলিতে রাজারা জমির স্বত্ব দান করতেন প্রাদেশিক রাজ্যপাল ও বৌদ্ধ মঠগুলিকে। এই স্বত্বের মধ্যে জমির সঙ্গেই থাকত প্রজারা। ভোগদখলি স্বত্ব নানারকম ছিল : সমবায়ী, ব্যক্তিগত, রাজকীয় এবং মঠ হিসেবে মালিকানা। শুষ্ক অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার একটা ধরন গড়ে উঠেছিল। জলাধারের নিকটস্থ অথবা নিচু জমির ক্ষেত্রে চাষের মাঠের হাতবদল হত গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্যে। মাঠের ধারের নালাটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত প্রত্যেক পরিবারকে। জলাধারের রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্য সকলের দায়িত্ব। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বছরে চল্লিশ দিন শ্রম দিতে হত, যাকে বলা হত 'রাজকার্য'। রাজধানী, মন্দির অথবা সেচের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই পরিষেবা ধার্য ছিল। ধান ফলানোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল গ্রামের অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম। প্রত্যেক গ্রামে একজন 'ভেলভিদেন' বা সেচপ্রধানকে বেছে নেওয়া হত। তিনি জলাধার, স্লুইস, নালা এবং মাঠের জলবন্টনের তদারকি করতেন। তিনিই ছিলেন গ্রামের মুখপাত্র।

বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী রাজা বা শাসকেরা এসেছেন, গেছেন। তাঁরা বিশাল জলাধার নির্মাণ করিয়েছেন, একজনের জীবৎকাল ছাপিয়েও সেই কাজ চলেছে। কিন্তু গ্রামসমাজ এর ওপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রত্যেক গ্রাম তার স্বনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন সেচ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকত।

৪

ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে পর্তুগিজ (১৫০৫–১৬৫৮) এবং ডাচেরা (১৬৫৮–১৮০১) এসেছিল বাণিজ্যের স্বার্থে। এদের শুষ্ক অঞ্চলে তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু ১৭৯৬ সালে ব্রিটিশরা যখন এল, ১৮১৫–র মধ্যে গোটা দ্বীপ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। ১৮৩২ সালে তারা 'রাজকার্য' বিলোপ করল। ব্রিটিশরা এই প্রথাকে দাসপ্রথার মতো এক চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথা হিসেবে চিহ্নিত করল। ফলে গ্রাম্য সেচপ্রধান 'ভেলভিদেন'–রা সেচের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হারাল। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছাড়া সমস্ত জমিকে তারা 'ক্রাউন ল্যান্ডস এনক্রোচমেন্ট অর্ডিনান্স' জারি করে দখল করে নিল। এর ফলে কফি প্ল্যান্টেশনে সস্তায় জমি বিক্রির সুযোগ খুলে গেল। চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। পাশাপাশি ভারত থেকে কফিচাষের জন্য আনা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ১৮৫০ সালে গভর্নর হেনরি ওয়ার্ড 'প্যাডি ল্যান্ডস ইরিগেশন অর্ডিনান্স' জারি করে ধানচাষ বাড়ানোর চেষ্টা করলেন। সেচ প্রকল্পের পুনরুজ্জীবনের ফলে প্রাথমিক কিছু সাফল্য পাওয়া গেল। ১৮৮৭–তে পরবর্তী গভর্নর গর্ডন একটা কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ড গঠন করলেন। শষ্যকরের এক–চতুর্থাংশ সেচের জন্য সংরক্ষিত হল। এই শতকের মধ্যে ৭৭৯টি গ্রাম্য জলাধার এবং ৪৫টি বৃহদায়তন জলাধার পুনরুজ্জীবিত হল। ধানচাষের এলাকা ৪ লক্ষ একর থেকে বেড়ে হল ৬ লক্ষ একর। অবশ্য এরই মাঝে ১৮৬৭–তে গভর্নর রবিনসন এসে জলকর চাপিয়ে দিলেন। চাষ করা অলাভজনক হয়ে পড়ল। ১৯০৬ সালে তৈরি হল সেচ দপ্তর।

কিন্তু আধুনিক হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দেশজ সেচ ব্যবস্থাকে দেখার ফলে দেশীয় ব্যবস্থার নকশা এবং নির্মাণপ্রণালী নষ্ট হয়ে গেল। গ্রাম পরিষদ এবং ভেলভিদেন–দের কেন্দ্রীয় সেচ–আমলাতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল। সমাজের ভিতর থেকে গড়ে ওঠা সমবায়ী কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়ল। স্থানীয় গ্রামসমাজের জন্য নানারকম শস্য ফলানো হত। তার বদলে এল রপ্তানির জন্য ক্যাশ–ক্রপ। জঙ্গল সাফ করে ফেলা হতে লাগল। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৮২০ সালে দ্বীপের ৮০ শতাংশ ছিল জঙ্গল, ১৯৪৮ সালে তা দাঁড়াল ৪০ শতাংশে।

৫

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা শাসক হিসেবে অব্যাহতি দিল ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের ছত্রছায়ায় একটা এলিট শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল। তামিলরা প্রথমদিকে এব্যাপারে এগিয়ে থাকলেও পরে সিংহলা সমাজেও একটা এলিট অংশ গড়ে ওঠে। এই নতুন শাসক এলিট পরিবারগুলি ঔপনিবেশিক আইনের সুযোগ নিয়ে বিপুল প্ল্যান্টেশন এলাকার মালিকানা হস্তগত করেছিল। স্বাধীনতার পর সেচ প্রকল্পগুলি এল নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে — জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বড়ো বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসিক্ত অঞ্চলের ঘনবসতি থেকে মানুষকে শুষ্ক অঞ্চলের জঙ্গলগুলিতে সরিয়ে আনা। নতুন সিংহলা এলিটেরা নিজেদের ভোগদখল না ছেড়ে নতুন জমিতে চাষিদের পুনর্বাসন দেওয়া মনঃপুত হল। বৌদ্ধ পুরোহিতদের একাংশ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট, কিছু চাষি এবং মূলস্রোত রাজনৈতিক দলগুলি এই নতুন সেচপ্রকল্পের নৈতিক সমর্থন জোগালো।

১৯৫০–এর দশকেই আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের অনুকরণে 'গাল ওয়া রিভার ভ্যালি ডেভলপমেন্ট স্কিম' নেওয়া হল। একে রূপায়িত করতে টেনিসি ভ্যালি অথরিটির কর্তাব্যক্তিরা শ্রীলংকায় এলেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী গাল ওয়া নদীতে বাঁধ দিয়ে যে জলাধার নির্মাণ করা হল, প্রধানমন্ত্রী ডে.এস.সেনানায়েক দ্বাদশ শতাব্দীর পরাক্রমবাহু সমুদ্রের অনুকরণে তার নাম দিলেন 'সেনানায়েক সমুদ্র'। এই সময় সিংহলা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রাক–ঔপনিবেশিক রাজকীয় গরিমা ফিরিয়ে আনা এবং এক বৌদ্ধ–সিংহলা ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। সেনানায়েক একটা রাজনৈতিক সুবিধাও পেলেন এই প্রকল্প থেকে। তাঁর দলের সমর্থকেরা নতুন সেচ এলাকায় জমি পেল, কেউ পেল কনস্ট্রাকশনের কাজ। এই বসতি এলাকায় তামিল ও মুসলমানেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। সেখানে নতুন সিংহলা বসতি গড়ে উঠল। ১৯৮১ সালের মধ্যে পূর্ব প্রদেশে সিংহলা জনসংখ্যা দাঁড়াল ১৫%, স্বাধীনতার সময় তা ছিল মাত্র ৪%। পরবর্তী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বসতির এই পরিবর্তিত গড়ন একটা প্রভাব ফেলেছিল। যে টেনিসি ভ্যালি প্রজেক্টকে মডেল ধরে নিয়ে এত কাণ্ড হল, তা নিয়ে পরে গুরুতর সমালোচনা হল। আমেরিকাতেই এই প্রজেক্টকে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তির পক্ষে হানিকর মনে করা হল।

মহাভেলি শ্রীলংকার দীর্ঘতম নদী। দ্বীপের ১৬ শতাংশ এলাকা জুড়ে ৩৩৪ কিমি দীর্ঘ এই নদী। পঞ্চম শতকে রাজা ধাতুসেনার আমলে মহাভেলি থেকে জল নিয়ে এসে কালাওয়েভা জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে প্রথম এই নদীর ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছিল। ১৯৬০–এর দশকে প্রস্তাব আসে : মহাভেলি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ৯ লক্ষ একর জমি নতুন সেচ এলাকায় পরিণত করা হোক; বাঁধ ছাড়া ১৫টি জলাধার, বহু টানেল এবং নালার মাধ্যমে মহাভেলির জল শুষ্ক অঞ্চলের ৭টি নদীতে বয়ে নিয়ে আসা হোক। বলা হল, এতে ২,৬৫,০০০ একর চাষের জমিতে সেচ হবে এবং ৬,৩৫,০০০ একর জঙ্গলের জমি চাষের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। দেশের ৪০ শতাংশ জমি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নতুন করে ৫৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। ত্রিশ বছরের এই প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছিল ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।

১৯৬৯ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা অর্থ অনুমোদনেও রাজি হয়নি। তৎকালীন UNP সরকার এতে অস্বস্তিতে পড়ে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে এর প্রথম পর্যায়ের তিনটি স্তরে অর্থ দিতে সম্মত করে। শর্ত হিসেবে জনকল্যাণমূলক খাতে খরচ কমানো, টাকার অবমূল্যায়ন করা এবং নানা সরকারি বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে সরকার বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে UNP–র পরাজয় ঘটে — SLFP, ট্রটস্কীপন্থী লংকা সম সমাজ পক্ষ এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কঠোর শর্তগুলির সমালোচনা করে। দু'বছর প্রকল্পগুলি আটকে যায়। কিন্তু ১৯৭৭–এ UNP ফের ক্ষমতায় এসে 'অ্যাকসিলারেটেড মহাভেলি প্রজেক্ট' হাতে নেয়। ত্রিশ বছরের প্রকল্প পাঁচ বছরে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। পরে ১৯৮৮ সালে এর খরচ ধরা হয় ৩৮০০ কোটি ডলার। প্রচুর বিদেশি অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। কারণ নতুন সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে। আগের সরকার ভূমি সংস্কার এবং বহু ব্রিটিশ মালিকানার জাতীয়করণ করেছিল। নতুন সরকার ১৯৭৮ সালেই 'মহাভেলি অথরিটি' তৈরি করে তাদের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দেয়, যাকে অনেকে সমালোচনা করে বলেছিল 'রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র'। এর জন্য সরকারের আলাদা মন্ত্রকও তৈরি হল। যদিও এতসব করেও মহাভেলি প্রকল্প তার ঘোষিত টার্গেটে পৌঁছাতে পারল না। যতটুকু পারল, তাতে চাষির বদলে লাভবান হল শহুরে ব্যবসায়ী ক্ষেত্র। পরে এই প্রকল্পের আরও গলদ ধরা পড়ল। দেখা গেল, তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন করা এই প্রকল্পে এর সম্ভাব্যতা, পরিবেশগত ও আর্থিক সমীক্ষা এবং পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল।

এই প্রকল্পের আওতায় কোটমালি উপত্যকায় যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল, তা এমন ত্রুটিপূর্ণ ছিল, ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে একটা ধস নেমে তা পুরো বিপন্ন হল। ১৯৮৫-তে বাঁধ এবং টানেলের কাজ শেষ হল বটে, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই তা পরিত্যক্ত হল। সামগ্রিক প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য বিদেশি সহায়তা-প্রদানকারী ও বিদেশি কন্ট্রাক্টরদের ভূমিকাও দায়ী ছিল।

প্রতিশ্রুতি ছিল, অ্যাকসিলারেটেড মহাভেলি প্রজেক্ট সম্পন্ন হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে, খাদ্যাভাব মিটবে, এনার্জি উৎপাদন হবে, বিদ্যুতের দাম কমবে। প্রকল্পের পর বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেল ছ'গুণ, মুদ্রাস্ফীতি হল ৪০০ শতাংশ। অর্থমন্ত্রীও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হন, ৪০ শতাংশ বিদেশি সাহায্য নষ্ট হয়েছে।

৬

মহাভেলি প্রকল্পের ব্যর্থতা হল দ্বীপ-সমাজে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ব্যর্থতা। দ্বীপের গ্রামসমাজ ছিল প্রাচীনকাল থেকেই বিকেন্দ্রীভূত। জাতগত আলাদা আলাদা গোষ্ঠীবদ্ধতা সত্ত্বেও ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পরের মধ্যে একটা দেওয়া-নেওয়া এবং সহাবস্থানের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। সেখানে সংঘর্ষের স্থান ছিল গৌণ। সিংহলা ও তামিল রাজা তথা প্রাক-ঔপনিবেশিক কোন শাসকেরই দ্বীপের সর্বময় কর্তৃত্ব গড়ে ওঠেনি। প্রথম ব্রিটিশ শাসকেরা এসে কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা কায়েম করল। তাদের হাত ধরেই এল দ্বীপ-সমাজের বুনিয়াদি সেচ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ। ফলে শুষ্ক অঞ্চল ও জলসিক্ত অঞ্চল, সমুদ্রের উপকূলভাগ ও অভ্যন্তরভাগের পাহাড়-সমতলভূমি-উপত্যকার বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পরিবেশে যে সামাজিক বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছিল শত শত বছরে, তা এই নতুন পরিকল্পনা-বিশারদদের কাছে অবহেলিত হল। তারা নতুন করে আমদানি করল বাণিজ্যিকভাবে কফি, চা ও রাবার প্ল্যান্টেশন। কান্ডিয়ান চাষিসমাজ এই প্ল্যান্টেশনে আগ্রহ না দেখানোতে দক্ষিণ ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ হাজার হাজার তামিল 'কুলি'-দের নিয়ে গিয়ে প্ল্যান্টেশনের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। কয়েক দশকের মধ্যেই যখন রোগভোগে কফিচাষ ধ্বংস পেতে বসল, তখন তার বদলে এল চায়ের প্ল্যান্টেশন। কিন্তু ব্রিটিশদের এইসব ভুল পরিকল্পনার ফলে বন্যা ও ম্যালেরিয়ার মড়ক ব্যাপক আকার ধারণ করল। লক্ষ লক্ষ মানুষ এর বলি হল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা এতে পরোয়া করল না। বরং তাদের পথ অনুসরণ করল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও আদবকায়দায় শিক্ষিত নতুন তামিল সাহেবরা। ব্রিটিশের উপঢৌকন 'স্বাধীনতা' পেয়ে সিংহলা শাসকেরাও তামিলদের হটিয়ে নিজেরাই সাহেব হতে চাইল। তাদের সাফল্য সমাজে জাতগত পার্থক্যকে নতুন এক মাত্রা দিল। ব্রিটিশরা শিখিয়েছিল গণতন্ত্র মানেই হল সংখ্যা, সংখ্যার জোরে আধিপত্য কায়েম করা। তা না পারলেই বঞ্চনা। অতএব সেই প্রতিযোগিতা নিয়ে এল সংঘাত।

ব্রিটিশ আমলে মিশনারিদের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে তামিলরা ব্যাপক আকারে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। সিংহলারা এব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার আগে তামিলরা জনসংখ্যার ১৫% হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৬০% সরকারি চাকরি তাদের হাতে ছিল। এবার স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে সিংহলারা সেই জায়গাগুলো দখল করতে শুরু করল। এরপর ১৯৭৩ সালে 'পলিসি অফ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন'-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রেও তামিলরা পিছু হটল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, বার্গার (যাদের পূর্বপুরুষ ইউরোপ থেকে এসেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা) এবং তামিলরা মিলে মোট জনসংখ্যার ২০% হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে এরা ছিল ৪০%। স্বাধীনতার পরে সিংহলাদের সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ বেড়ে গেল। ১৯৮৩ সালে এসে তা ৯৫% পেরিয়ে গেল।

শিক্ষাক্ষেত্র, সরকারি চাকরি এবং সামরিক বাহিনীতে আনুপাতিক শক্তির ভারসাম্যের এই বড়ো রদবদল সিংহলা—তামিল সংঘাতে বারুদ জুগিয়ে দিল। মহাভেলি প্রকল্পের মতো এত বড়ো প্রকল্পের ব্যর্থতা সিংহলা রাজনৈতিক সমাজকে আরও দেউলিয়া করে দিয়েছে। দ্বীপ-সমাজকে নতুন করে দেওয়ার আর কিছুই তাদের ছিল না। ফলে সামরিক ক্ষমতাকে সম্বল করে তারা হতাশাগ্রস্ত তামিল যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

বিপরীতে 'তামিল ইলম' বা আলাদা তামিল রাষ্ট্রের মধ্যে যারা পরিত্রাণ চেয়েছে, তারাও নিজেদের আদর্শগত ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সামরিক পন্থা আর কেবল পন্থা থাকেনি, তাদের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে তা সর্বময় হয়ে ওঠে। ক্রমাগত আঘাত-প্রত্যাঘাত এবং জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তারা এতটাই মরীয়া হয়ে উঠল, ২০০৬ সালের ২১ জুলাই এলটিটিই মাভি আরু জলাধারের স্লুইস গেট বন্ধ করে দিল। পূর্ব-প্রদেশের ১৫০০০ গ্রামের জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। এটা ঠিকই এই অঞ্চল ছিল সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা এত বড়ো হয়ে উঠল, সমাজের আপামরের প্রশ্ন এবং চাষিসমাজের প্রশ্ন হয়ে গেল নিতান্ত গুরুত্বহীন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তামিল গেরিলাদের নৈতিক পরাজয়। অবশ্যই তা দেউলিয়া সিংহলা রাজনীতির কাছে নয়। বরং সমাজের যে অন্তঃসলিলা প্রবাহ, যাকে আমরা ঐতিহ্য বলি, সেখানে ধাক্কা দিয়ে গেরিলারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

শ্রীলংকার তামিল সাহিত্য

*তামিলদের জঙ্গি আন্দোলন আর সরকারি সন্ত্রাস শ্রীলংকাকে ছিন্নভিন্ন করেছে গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। এই সময়কে ধরে যেসব গল্প, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন সেখানকার মানুষ, তা তামিল ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে নিবেদিতা মজুমদার সম্পাদিত 'দ্য আদার সাইড অফ টেরর' নামক একটি বইতে। সেখান থেকে কবি Cheran ও **Jesurasa**-র দু'টি কবিতা এবং Jean Arsunayagam-এর লেখা একটি গল্প **In the Garden Secretly**, A. Sivanandan-এর লেখা **When Memory Dies** উপন্যাসের সামান্য কিছু অংশ এখানে বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল।*

কেঁদো না আম্মা

কেঁদো না আম্মা,
তোমার দুঃখের ভার বইবার জন্য কোন পাহাড় এখানে নেই।
কোন নদী নেই তোমার চোখের জল ধুয়ে ফেলবার জন্য।

যে মুহূর্তে ও বাচ্চাটাকে ওর কোল থেকে তোমার
হাতে তুলে দিল ঠিক সেই মুহূর্তেই গর্জে উঠল বন্দুকের নল।

তোমার উঠোনের ওপর, ধুলোয় শুয়ে,
ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত।
ফেটে পড়া বোমার তাপে তোমার সব উজ্জ্বল স্বপ্ন পুড়ে গেছে।

তোমার পায়ের নুপুর থেকে যা খসে পড়েছে
তা চুনিও না, পান্নাও না;
রক্তের অপরাধ চেনবার জন্য কোন
পান্ডিয়ান রাজা আজ আর নেই।

ঘুমহীন রাতে তোমার কোলের ছেলেটা যখন অশান্ত
বিছানায় ছটফট করতে করতে "আপ্পা" বলে কেঁদে উঠবে
তখন তুমি কী বলবে তাকে?

তাকে বুকের কাছে চেপে ধরে, পায়চারি করতে করতে
চাঁদের দিকে আঙুল তুলে বোলো না,
"আপ্পা ঈশ্বরের কাছে আছেন।"

বরং তাকে বোলো যে এই দুঃখ বয়ে চলে
তাকে বোলো ছড়িয়ে পড়া রক্তের গল্প
তাকে বোলো সমস্ত সন্ত্রাস শেষ করে ফেলার
লড়াইয়ে শামিল হতে।

কবি চেরান, অনুবাদ : চূর্ণী ভৌমিক

বাড়ি ফিরছো হেঁটে
সমুদ্রের বীচ থেকে অথবা হয়তো
সিনেমা দেখার পর।
হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজ
একজোড়া বুটের পালিয়ে যাওয়ার খসখস শব্দ।
রাস্তার ওপরে তুমি মরে পড়ে থাকবে।
তোমার হাতে গজিয়ে উঠবে একটা ছোরা,
একটা পিস্তলও ফুটে উঠতে পারে।
"সন্ত্রাসবাদী" হবে তুমি।
ভয়ে কেউ প্রশ্নও করবে না।
নৈঃশব্দ জমে বরফ।
কিন্তু মানুষের মনে গোপনে ফেটে পড়ছে
ঘৃণার বুদ্বুদ।

কবি জেসুরাসা, অনুবাদ : চূর্ণী ভৌমিক

এবং তোমার ভাগ্য

গোপনে বাগানে

গোধূলি। এখানে সন্ধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে ওঠে — আমি জানি। ধুলোমাখা বুটজুতোর ভিতরে আমার পা দুটো অভিযাত্রীর ভঙ্গীতে চলেছে। হাত দুটো টি ফিফটি-সিক্স রাইফেলের ওপর থেকে মুঠো একটুও আলগা করেনি। আমি সতর্ক। দৃশ্যপট জুড়ে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আকাশ ঘিরে পাম গাছের পাতা, পাতাগুলো অন্ধকার ডানার মতন। একটা পরিত্যক্ত গ্রাম, একসময় এখানে অনেক বাড়ি ছিল, বাড়িগুলো এখন পড়ে আছে বারুদ ফুরিয়ে যাওয়া কামানের গোলার খোলের মতন। ধ্বংসস্তুপের চারপাশ ঘেরা পামের বেড়া এমনভাবে ভেঙে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে কোনও দৈত্যের হাত প্রচণ্ড ক্রোধে ওগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক রাস্তাঘাটে পাতা ল্যান্ডমাইনগুলো এড়ানোর জন্য। আক্রমণকারী সৈন্যরা এভাবেই পথ করে নেয়। বিশাল চাকাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত বেড়া, যে বেড়াগুলো তাদের আড়ালে বসবাসকারীদের জীবনের নিজস্বতাকে রক্ষা করত। মুছে গিয়েছে সেই সমস্ত পরিবারের জীবনযাপন ও আচার ব্যবহারকে, যারা বংশানুক্রমে এই গ্রামে বাস করত — এমন সব মানুষ যাদেরকে আমরা কখনও চিনতাম না, কখনও চিনতেও পারবো না।

আমার চারপাশে শুধু নৈঃশব্দ। কোনও মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে না। সামান্য হাওয়াতেই পামের পাতার মর্মর। একটা কাক ডাকার কর্কশ আওয়াজ। দূরে আরো কতকগুলো পাখির ডাক আমার একাকীত্বকে আরো তীব্র করে তুলেছে। সাথে সাথে বাড়ছে আমার ভয় — অজানা কিছুর ভয়।

সামনের একটা বাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একদা নীলরঙা দেওয়াল ছিন্নভিন্ন — রং চটে গেছে, পুড়ে গেছে। ছাদটা নিচে ঝুলে পড়েছে। বাড়িটার চতুর্দিক ঘেরা গাছের ডাল সোনালী ফুলে ছেয়ে রয়েছে আর মাটিতে ছড়িয়ে আছে অজস্র ফল। বোগেনভেলিয়া উথলে উঠছে, যে সূর্যাস্তের রঙের জলপ্রপাত : গোলাপী মিশেছে কমলায়, সাদা, হালকা বেগুনি, গাঢ় লাল। একটা নিঃসঙ্গ যুঁইয়ের ঝাড় সাদাফুলে ছেয়ে আছে। কোনও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। একটু দূরে আমার সাথিদের কন্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি — তারা তাদের নিজস্ব আবিষ্কার নিয়ে উচ্চকিত। আমরা এখনও খুব সতর্ক। যে কোনও জায়গায় সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে থাকতে পারে। আমরা বারবার ওপরে গাছের দিকে তাকাই — কোনও স্নাইপার লুকিয়ে আমাদের তাক করছে কিনা!

আমি বাড়িটার দিকে এগোই। নীল দেওয়াল সাধারণত হয় না। মনে হয় এটা কোনও গীর্জা। না, এটা গীর্জা হতে পারে না। গীর্জার যে স্থাপত্য সেরকম এটা দেখতে নয়। আমি জানি এই এলাকায় এমন কিছু গীর্জা আছে যা কয়েকশ' বছর আগের — সেই পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আমলের। আমেরিকান মিশনারিও গীর্জা বানিয়েছিল — সাথে স্কুল আর কলেজ। এখানে অনেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। আহে এখানে সব বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পড়ার জন্য দক্ষিণের ছাত্ররা উত্তরে চলে

আসত। আমার ঠাকুর্দাও তার আমলের বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের কাছে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এই উত্তরে চলে এসেছিল।

আমি আমার মতো হতে চাই। যখন থেকে আমি উত্তরে এসেছি তখন থেকে একটা ব্যাপার বোঝার চিন্তা আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে —আমি এখানে কী করছি? আমার অন্য সঙ্গীরা জয়ের তুরীয় আনন্দে মাতোয়ারা। আমাদের বোঝাই ট্রাকগুলো যখন ভাঙা রাস্তা দিয়ে বড়ো বড়ো গর্ত এড়িয়ে দুলকি চালে চলে তখন ওরা গান গায়। যারা পায়ে হেঁটে এগোয় তারা খুব সাবধানে চলে, কারণ আমাদের আগমন প্রত্যাশায় গেরিলারা সর্বত্র ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছে এবং তাতে আমাদের অনেকে মারাও গেছে। গেরিলারা আমাদের প্রতিটি নড়াচড়াকেই ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মতলব হিসেবে দেখে। যদিও আমরা আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাবি। কিন্তু যে জনসাধারণকে আমরা মুক্ত করছি ভাবি, তারা কি আমাদের সেরকমই ভাবে?

দক্ষিণের সৈন্যরা কঠিন লড়াই লড়েছে। অপারেশন সানশাইন ওয়ান। আমরা উপদ্বীপের একদম অন্তঃস্থল অবধি ঢুকেছি। এখন আমরা সবাই যুদ্ধ-জীর্ণ আর পরিশ্রমের ঠ্যালায় আমাদের সবার হাড়-মাস কালা হয়ে গেছে। আমরা বহুদিন আমাদের জুতো-জামা পাল্টাইনি। আমাদের দেখে মনে হয়, এই লাল মাটি সাদা বালি আর সবুজ-কালো পাতার দেশ থেকে এক নতুন ধরনের পোকা হিসেবে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে; শত্রুর চোখকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আমাদের পোষাকে জংলাপাতার নকশা। সাঁজোয়াগাড়ি আর ট্যাঙ্কগুলোও একই নকশায় চিত্রিত। আমার ওগুলোকে কেমন বেখাপ্পা লাগে।

যুদ্ধ পাল্টিয়ে দিয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকেও। এক এক সময়ে মনে হয় আমাদের পোষাক আর সামরিক যানের জংলা নকশাগুলোই শুধু সবুজের সরবরাহ করছে। এমন সব করুণ প্রান্তর আছে যেখানে শুধু হেলমেট পরা সেনাবাহিনী — তারা বন্দুক হাতে ভারী বুট পরে নোংরা সব খাঁড়ি দিয়ে ছুটছে, আড়াল নিচ্ছে, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে অবস্থান গ্রহণ করছে। কিছু সময় বাদে বাদেই মেশিনগানের আগুন ঝরানোর শব্দ। বুলেটগুলো কাকে আঘাত করছে? শত্রুকে কখনোই দেখা যাচ্ছে না। কেবলমাত্র মিলিটারি ম্যাপেই যুদ্ধ চলে। ম্যাপে উপদ্বীপের গায়ে আঁকা কালো মোটা তীর চিহ্ন — চিহ্নগুলো সামরিক অভিযানের অগ্রগতি বোঝাচ্ছে। বোর্ডরুমে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হচ্ছে। পদাতিক বাহিনী যথেষ্ট নয়, আমাদের দরকার বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনী, রণতরী, ভারী গোলন্দাজ বাহিনী।

গেরিলাদের সাথে যুদ্ধ কখনোই সোজা নয়। আমার ইতিহাসের শিক্ষাগুলো মনে আছে। উপদ্বীপের যুদ্ধ, স্পেন, ফ্রান্স, ইথিওপিয়া।

প্রথাগত যুদ্ধের পুঁথিগত নিয়মকে গেরিলারা হাস্যস্পদ করে তোলে। পাহাড়ে ওরা পাথরের প্রাকৃতিক আড়ালকে কাজে লাগায়। এখানে এই গভীর জঙ্গলে ওদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সর্বত্র নিরপরাধ মানুষ, যারা কখনোই এই বিরোধের মধ্যে নেই তারা 'দুইপক্ষের গুলি বিনিময়ের মাঝখানে' পড়ে যায় — আর অপ্রিয় সত্যকথা এভাবে একটু রেখে ঢেকে বলাই রীতি। তত্ত্বগত ভাবে অবশ্য এটা জানা যে যুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের প্রাণহানি হয়েই থাকে। কিন্তু আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করি। সব মিলিয়ে আমার নিজের দেশই তো ধ্বংস হচ্ছে।

অপারেশন সানসাইন ওয়ান শেষ হওয়ার পর আমরা যারা এতে অংশ নিয়েছিলাম তারা সবাই একসঙ্গে হয়েছিলাম। উপদ্বীপের রাজধানীতে পৌঁছনোর পর সেনাবাহিনীর লোকেদের মুখের চেহারা হয়েছিল ঠিক সেই স্কুলের ছেলেদের মতো যারা সদ্য একটা ক্রিকেট ম্যাচ জিতে এসেছে। একটা মারাত্মক ম্যাচ, কিন্তু ঠিক সেরকমই শিশুসুলভ বিজয় উল্লাস সকলের মুখেই — যদিও আমাদের একটা অংশ সরাসরি খেলেনি।

এরকম বালকসুলভ জয়ের তাগিদই কি মানুষকে অজানা-অচেনা জায়গায় এগিয়ে যাওয়ার গতি জোগায়? আমাদের অভিযান শুরু করবার আগে কমান্ডাররা আমাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করে, "তোমরা বীর। তোমরা মাতৃভূমির জন্য সংগ্রাম করছ। তোমাদের দেশপ্রেম পুরস্কৃত হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে লড়ছি।"

আমি জানি না আমি কেন এর মধ্যে আছি। এককভাবে দেশপ্রেম আমাকে তেমন উৎসাহিত করে না। আমি যখন উপদ্বীপের ওপর দিয়ে 'সিয়া মারচেত্তি', 'অ্যাভ্রো' বা 'অ্যান্তোনভ' প্লেন চালিয়ে উড়ে বেড়াই তখন নিজেকে শুধু প্রশ্ন করি, 'কেন আমি এসব করছি?' আমি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা বয়ে নিয়ে যাই এবং তাদের যুদ্ধকে বিমানের শক্তি দিয়ে সাহায্য করি, খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যাই, এবং উপর থেকে নজরদারি করি। টাইগারদের শিক্ষা শিবির ও অন্যান্য মিলিটারি বিষয়ের সুলুক সন্ধান আমাকে দিতে হয়। যখন কোনও একটা সামরিক-যান দেখে সেটা ওদের বলে সন্দেহ হয় তখন সেটাকে নিশানা করি। জঙ্গলের গভীরে ওদের মাটির তলার বাঙ্কারগুলো পামগাছের পাতার আড়াল থেকে খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমি জানি জঙ্গলের মধ্যেও মাটির তলায় গোপন পথের জাল বিছানো আছে — গ্রাম থেকে গ্রাম, হাসপাতালে, অস্ত্রাগারে যাওয়ার শুঁড়িপথ ছড়ানো আছে। মাটির গভীরে আরেকটা অন্য জীবন চালু আছে। পৃথিবীর অন্তরের অন্তঃস্থলে মানুষ বেঁচে আছে — শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। যখন আমি উড়ছি তখন এইসব জানা খুবই উত্তেজনাকর যে একটা ফুটন্ত জীবন, একটা সৃষ্টিশীল কারিগরি অদৃশ্য হয়ে মাটির তলায় থেকে যাচ্ছে। বাইরে মাটির মানচিত্রে আমি যা ওপর থেকে দেখতে পাই তা হ'ল লাল, খয়েরি, সাদা, সবুজ, নীলের ছককাটা জমি — চাষের মাঠ, ফসলের ক্ষেত, গ্রাম, শহরতলী, ঘরবাড়ি, 'কোভিল' আর গীর্জা — সব ছোটো ছোটো খেলনা পুতুলের মতো।

যুদ্ধের নির্দিষ্ট নিজস্ব ভাষা আছে। একজন 'সন্ত্রাসবাদী' 'নিহত' হয়েছে। একজন "সৈনিক' 'প্রাণদান' করেছেন। এগুলো সব বহিরঙ্গের শব্দ, যা এই বর্তমান বিরোধ তাজা জীবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কে ঠিক করবে যে কোনজনা কী, দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? আমরা সবাই অন্ধের মতো জঙ্গলে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, আর দিনের পর দিন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সত্বার সবচেয়ে ভিতর পর্যন্ত। আমরাও আমাদের অভ্যন্তরে শুঁড়িপথের জাল বিছিয়ে চলেছি, গড়ে তুলেছি সুরঙ্গ — যার মধ্যে দিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা-অনুভূতিগুলো চলাফেরা করে। গোপনতা আর দ্বিচারিতা আমাদের কাছে এখন স্বাভাবিক। আমরা আমাদের লুকনো রাস্তা তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে চলেছি, কখনও দিনের আলোয় বেরিয়ে আসছি না।

শুরুতে, ওদের জন্য নেতা ছিল, যে ওদেরকে ওইসব গহীন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। ওদের কেউই একা সেখানে যেতে পারত না। যখন ওরা নেতার মুখের দিকে তাকালো তখন দেখল তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। শান্তির সময়ে যে মুখটা বর্ণহীন বা এমনকী মনে রাখার মতো নয় বলে মনে হয়েছিল, সেই মুখ এমন বীরত্বব্যঞ্জক ও মহাকাব্যিক হয়ে উঠল যে মনে হল এই সেই দেবতার মুখ যার তোমরা পুজো করো। তাই হাজার হাজার মানুষ নেতার জন্য ও মহান উদ্দেশ্যে প্রাণ দিতে চাইল। তাহলে সেই দেবতা-মানুষ মারা গেলে কী হল? তার জায়গা নেওয়ার জন্য সবসময়েই আরেকজনকে পাওয়া যায় যে আবার জনগণকে অনুপ্রাণিত

করবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য, বিস্ফোরণে ফেটে মরে যেতে ও শরীরের অঙ্গগুলোকে টুকরো করে উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত করার জন্য।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি আমার নিজের ভাগ্যে কী আছে। আমি একজন বৈমানিক। বিভিন্ন অভিযানে উড়াল দেওয়া আমার জীবনকে একটা অর্থ দেয়। মাটির বন্ধন ছেড়ে উঁচুতে আকশে উড়ে যেতে আমার ভাল লাগে। আমার এক বন্ধু আছে, সন্ন্যাসী, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে। সে 'দেওয়া'দের কথা বলে — তারা দেবতা, তারা মেঘের মধ্যে থাকে — উষ্ণ মেঘ, বজ্র মেঘ, বাতাসী মেঘ, বাদুলে মেঘ —সবরকম মেঘের মধ্যে। আমি যখন মেঘের মধ্যে তাকি তখন নিজেকে দেবতা মনে হয়, মনে হয় আমি উচ্চমার্গের কেউ। আমি যখন ওপরে উঠি তখন নানা রকমের কল্পনা ভিড় করে আসে। আমি নিচে থাকলে যা কখনো হয় না, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের সবটা আমি ওপরে উঠে পাই। আমার মনটা এমন দ্রুতগামী হয়ে ওঠে যে নিজের মনকেই তখন চিনতে পারি না, আমার মনে হয় আমিই ইতিহাসের এক অংশ। নাম না জানা মুখ আর অনুল্লেখযোগ্য কাজে ভর্তি এই পৃথিবীতে আমি এমন কিছু কাজ করে যেতে চাই যা অর্থবহ হবে। সম্ভবতঃ এটাই আমি চাই যে এমন কিছু করব যা মহাকাব্যের মতো শোনাবে অথবা সেই সব বীরদের গাথা–কাহিনীর মতন যাদেরকে আমি আমার আদর্শ করেছি।

আমি জানি আমি কারো কারো কাছে একজন হিরো ও দেশপ্রেমিক। কিন্তু আমি বোকা নই। আমি জানি অন্যদের কাছে আমি কী। আমি আকাশ থেকে নীচের উপদ্বীপের দিকে তাকাই। দেখে মনে হয়, কী সুবিন্যস্ত, কী সুগঠিত। কিন্তু আমার অভিযানের উদ্দেশ্য এই বিন্যাসকে এলোমেলো করা। যুদ্ধের ছবি এখন আর সাদায়–কালোয় নয়, এটা এখন আর বীরত্বের ও মহাকাব্যিক নয়; কারণ সাধারণ মানুষ এরকম একটা নিঁখুত যুদ্ধের ছবির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যখন কলেজে পড়তাম, একটা বইতে একটা ছবি দেখেছিলাম। আমার মনে আছে। আমাদের শিক্ষক বলেছিলেন, ছবিটার নাম গুয়ের্নিকা। ছবিতে উত্তর স্পেনের বাস্ক গ্রামাঞ্চলের একটা গ্রামে বোমা ফেলার দৃশ্য দেখানো ছিল, প্রদেশ — কোন প্রদেশ যেন? ভিস্কাইয়া। হ্যাঁ। আমার মনে আছে বিধ্বস্ত সেই গ্রামের ছবি, বোমায় ভেঙে পড়া বাড়ি, ভয়ার্ত চোখ, একদা মানুষের খণ্ডিত দেহের মূর্তি, ঘোড়া আর ষাঁড়ের আর্তনাদ। ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়, ষাঁড়ের লড়াই। যে বোমা ফেলেছে সে এখানে 'মাতাদোর' — অর্থাৎ ষাঁড়কে তরোয়াল দিয়ে বধ করছে। আমার চারপাশে আমি যা দেখছি, তার সাথে ছবির কী মিল; একটা গৃহযুদ্ধ, নাগরিকরা আক্রান্ত, জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রেরণাদায়ক নেতা; মৃত্যুর বিকৃতি, পলায়মান চেহারাগুলো — পুরুষ মহিলা শিশুদের; প্রত্যন্ত গ্রামে বর্বরতা আর গণহত্যা। এই ছবিটা আঁকা হয়েছি পঞ্চাশ বছরেরও আগে; ১৯৩৭ সাল নাগাদ। গুয়ের্নিকা বোমা ফেলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাইরের শক্তি, জার্মানদের সহায়তায়। মৃত্যু আর মৃতদেহের সমাধি দেওয়ার পর সীমারেখা বলে কিছু থাকে না। কলিচূণের মতো, স্মৃতির প্রলেপ মুছে দেয় অতীত যন্ত্রণার অনুভূতিকে। তারপর থেকে আমরা আর কেউই সম্পূর্ণ মানুষ নই। আমাদের চোখে গুয়ের্নিকার প্রতিবিম্ব।

যে উচ্চতায় আমি উড়ে বেড়াই, সেখান থেকে কেউ কী করে বলবে নিচে যে আছে সে গেরিলা না সাধারণ নাগরিক? সাধারণ মানুষও তার বাগানে বাঙ্কার তৈরি করে, আর মাথার ওপর বোমারু বিমানের আওয়াজ শুনতে পেলে সেই বাঙ্কারের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই যুদ্ধে আমরা সকলেই ভুক্তভোগী, আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। উভয় পক্ষই হয়েছি।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি যুদ্ধ কি কখনও শেষ হবে? কখন? আমরা কি বৃদ্ধ বয়স অবধি বেঁচে থাকব? সামরিক ইতিহাসে কি আমাদের এই যুদ্ধের ঘটনা নথিভুক্ত থাকবে? আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপের ইতিহাস কি পৃথিবীর অন্যান্যদের কাছে গুরুত্ব পায়? আমি ইতিহাসের বই পড়তে ভালবাসি — বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস — ব্লিৎস, ড্রেসডেনে আগুনবর্ষী বম্বিং, হিরোশিমা। এবং যে নামগুলো আজকের কাগজে উঠে আসে : সারাজাভো, গ্রজনি, রোয়ান্ডা। সর্বত্র মেঘগুলো রক্তের রঙে লাল, বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মরণোন্মুখের আর্ত চিৎকার। মৃত্যু প্রতিটা দিনের সত্য — যা নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমরা সবাই মৃত্যুর আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এই নিরন্তর মারামারিতে আমরা সকলেই অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার শেষ মুহূর্তটা কেমন হবে। একটা বিমান ভেঙ্গে পড়া? একটা ল্যান্ডমাইন? একটা বিপথগামী বুলেট, যেটা আসলে অন্যকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল?

আমরা এই উপদ্বীপে এসেছিলাম বিজয়ী হিসেবে। জয়োৎসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রবেশ করার কথা। কিন্তু জয়লাভের ঘোষণা নিয়ে কোনও ব্যানার টাঙানো হয়নি, কোনও সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গী, কোনও লাল কার্পেট ছিল না, ছিল না কৃতজ্ঞ জন–সাধারণ যারা আমাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। রাস্তাগুলো ছিল নীরব–শীতল, শুধু সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক, জীপ, মোটর সাইকেলের আওয়াজে পথ কেঁপে উঠছিল, আর ছিল রণমত্ত সৈন্যের দল। জনসাধারণ সব দূরে পালিয়ে গিয়েছিল, পালিয়েছিল আমাদের জয়লাভের ফলশ্রুতিতেই।

তাই আমরা নৈঃশব্দ আর শূন্যতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম গ্রামগুলোর দিকে এবং যে যার নিজস্ব আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছিলাম। কোনও কোনও সময় তা খুব আশ্চর্যজনক : নাগরিকদের জন্য বানানো একটা প্রমোদ উদ্যান, একটা প্রাসাদ যেটাকে অনেকেই বলল ওদের নেতার প্রাসাদ, যেখানে আত্মঘাতী অভিযানে যাওয়ার আগে ওরা শেষবার একসাথে খাওয়া দাওয়া করত আর নেতাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গ্রুপফটো তুলত। এটা অবশ্য সত্যিকারের প্রাসাদ নয় — একটা বড়ো বাড়ি, একসময় যার মালিক ছিল একজন ধনী ব্যক্তি; বাড়িটায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো সুসজ্জিত খাঁচা ছিল আর ছিল চমৎকার সব ছবি টাঙানো। দক্ষিণের লোকেদের কাছে এসবের মানে বোঝানো মুশকিল। আসলেতো আমাদের কেউই সেই অতিমানব নেতাকে দেখিনি, তার সম্পর্কে কেউই বেশি কিছু জানেনা।

আমাদের জয়ের পর আমরা দক্ষিণের সিংহমার্কা পতাকা উত্তোলন করেছিলাম। উত্তরের, কার্যত এই আলাদা রাজ্যের নিজস্ব পতাকা আছে, তাতে বাঘের ছবি আঁকা। এই দুই জন্তু অনিবার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের বাধ্য করছে আরও গভীর, গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে চলে যেতে, যেখানে লুপ্তপ্রায় প্রাণীটির নাম মানুষ।

এখানে নীরবতাকে স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা যায়, আমি তার কম্পন টের পাচ্ছি আমরা চামড়ার ওপরে। আমি আমার টি–ফিফটি সিক্স রাইফেলটা আরও শক্ত মুঠোয় চেপে ধরি। আমরা পৌঁছনোর আগেই কেমনভাবে দল বেঁধে সবাই চলে গেছে। আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কিছু বলা হয়েছিল — আমরা আক্রমণকারী সৈন্য, আমাদের কামানের গোলার আওয়াজ আমাদের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল। আমরা জানি আমরা এখানকার জনগণকে মুক্ত করতে এসেছি, যদিও কখনও স্পষ্ট করে বলা হয় নি কাদের হাত থেকে এই মুক্তি। জনগণও যদি সত্যিই এটাকে মুক্তি ভাবতো তাহলে তারা পালালো কেন?

এরই মাঝখানে এই নীলবাড়িটা। আম এর মধ্যে ঢুকে পড়ি। এরকমটা দক্ষিণে থাকলে নিশ্চয়ই আমি করতাম না। আমি যদি কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করতে তার বাড়িতে যেতাম, তাহলে সেখানে ঢোকার মুখেই তাকে ডাকতাম যাতে সে বেরিয়ে এসে আমাকে সাদরে ডেকে নিয়ে যায়। আমাকে জিজ্ঞেস করা হ'ত বন্ধুদের খবর কী, বিমান বাহিনীতে যে বন্ধুরা আছে তাদের খবর, কলেজের বন্ধুদের খবর আর উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধের সংবাদ। ওদের কাছে যুদ্ধ অনেক দূরের একটা বিষয়। দক্ষিণে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত। অথবা সবেমাত্র সরকারি আমলা বা উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে কোনও কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে। তাদের কাছে আমার একটা আলাদা গ্ল্যামার আছে, কারণ আমি বিমানবাহিনীতে আছি। এর জন্য তারা আমাকে তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চায়। আমার বন্ধুদের বাবা-মায়েরা আমাকে 'পুথা' বা ছেলে বলে ডাকে, ছোটো ছোটো ভাই-বোনেরা ডাকে 'আইয়া' — যার মানে হল বড়দাদা।

এই ফাঁকা বাড়িটায় আমার নিজেকে খুব একা লাগে। চারদিকের দেওয়ালগুলো আমার দিকে অচেনা লোকের মতো তাকিয়ে আছে। পায়ের নিচে সিমেন্টের ভাঙা মেঝেয় নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এখানে কেউ নেই যে আমাকে বলবে 'এসো', এমনকি সামান্য এক গ্লাস জলও কেউ এগিয়ে দেবে না। এখানকার জলে একটা আলাদা গন্ধ আছে, আছে এই মৃত্তিকার, এই ভূখণ্ডের স্বাদ।

আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন পালি বলে যে পোর্ট পেড্রোর বাসিতিকা দুর্গের কুয়োর জল স্বচ্ছ আর মিষ্টি। ওর বাড়ি কান্ডিয়ান গ্রামে, ও বলে, সেখানকার ঝর্ণা আর কুয়োতে যে জল পাওয়া যায়, তা শীতল ও তাজা আর তাতে আছে লতাগুল্মের আস্বাদ। পালি দশ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে আছে আর এই উপদ্বীপেও অনেকদিন কাটিয়েছে। তার বিশ্বাস আমাদের বিপক্ষে যারা লড়াই করছে তাদের মনের একাগ্রতা অনেক তীব্র কারণ তারা লড়াই করছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা স্বপ্ন নিয়ে — উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে একটা আলাদা রাষ্ট্র — 'ইলম' গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে।

আমার বাড়ি দক্ষিণের একদম শেষ প্রান্তে, 'দোন্দ্রা হেড'-এর লাইটহাউসের খুব কাছে। সেখান থেকে আমি দেখেছি মাঝে মাঝেই শক্তিশালী আলোকরশ্মি সমুদ্রের জলকে আলোকিত করে তুলছে — কোনও নৌকা যাতে বিপদে না পড়ে তাই সদাসতর্ক প্রহরা। এখানে কোনও আলো নেই। ঘরের বাইরে অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। আমার পকেটে একটা টর্চ আছে। টর্চটা আমায় সাহায্য করবে ফাঁকা ঘরগুলোর মধ্যে পথ দেখাতে।

যাদের পরিবার এখানে থাকত, এই বাড়িতে, তাদের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে — বাড়িতে মা সবকিছু নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখে। যতবার আমি বাড়ি ফিরি, ফিরে দেখি আমার ঘর ঠিক একইরকম আছে। তাকের উপর রূপোর ট্রফিগুলো, কলেজের ক্রিকেট দল আর রাগবিদলের সাথে আমার ফটো, পুরনো পড়ার বইগুলো — সব সযত্নে সাজানো আছে। সব সুবিন্যস্ত, জীবনের অর্থ প্রবাহমান। আমি ভাবু যারা এখানে থাকত তারা এখন কোথায়? তারা কারা, যারা এই ঘরগুলোয় বসবাস করত, এই বাগানে হাঁটত, এই গাছ আর ফুল যারা লাগিয়েছিল? এই উপদ্বীপ থেকে নিষ্ক্রমণের সময়ে তারা কি খুশিমনে গেছে? নাকি তারা বাধ্য হয়েছিল?

আমি একটা দরজা ঠেলে খুললাম।পাল্লার কাঠ ছেতড়ে গেছে, কব্জার ওপর ঝুলছে দরজাটা। ছায়াঢাকা ভিতরের ঘরটায় একটা অদ্ভুত আলোর আভা। আলোটা আসছে চুনকাম করা ইঁটের দেওয়ালের মধ্যে একটা কুলুঙ্গির ভিতর থেকে — জানলার ভাঙ্গা কাঁচের পাল্লায় প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে তার রশ্মি। দেখে মনে হচ্ছে, একটা মৃদু আলোর বাল্ব, কিন্তু আমি জানি তা হতে পারে না। বেশ কয়েকবছর ধরে এই উপদ্বীপে বিদ্যুৎ নেই। আমি কুলুঙ্গিটার দিকে এগিয়ে যাই। হঠাৎ সামনে ভেসে ওঠে যীশুখ্রিস্টের একটা মূর্তি। এখানে যারা থাকত, তারা খ্রিস্টান ছিল? তা হলে আমাদের সাথে তাদের মিল আছে : আমরা একই ঈশ্বরের পুজো করি, একই সন্তদের কাছে প্রার্থনা জানাই, একই প্রার্থনা সঙ্গীত গাই, যদিও উপাসকদের ভাষায় কিছু ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রার্থনাগুলো একই হবে : 'রোজকার রুটি আজ আমাদের দাও ... আমাদের পাপ মার্জনা করো, যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করছে তাদেরও যেন আমরা মার্জনা করি, অমঙ্গল থেকে আমাদের উদ্ধার করো ... এই রাজ্য তোমারই ...'।

মূর্তিটা যেন ভেতর এবং বাইরে, দুইদিক থেকেই আলো ছড়াচ্ছে — আরুগম উপসাগরের তমসাচ্ছন্ন জলে সামান্য ঢেউ উঠলেই যেমন ফসফরাস জ্বলে ওঠে তেমন করে। খ্রীষ্টের মুখমণ্ডল, সারা শরীর আর উতলা উত্তরীয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে — সেখান থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে শূন্য ঘরের অন্ধকার কোণগুলোতে। মূর্তিটার একটা হাত ভাঙ্গা। আমি খ্রীষ্টের মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না। তাতেই বা কী? আমি ধরা পড়ে গেছি, মূর্তিটার প্রজ্জ্বলিত দীপ্তি আর ভাঙ্গা কাঁচে তার প্রতিফলিত ভাঙ্গা প্রতিবিম্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি আর নড়তে পারছি না।

এই মুহূর্তে এই গভীর প্রশান্তি এই স্থানের বা এই কালের নয়। আমার চেতনা থেকে মুছে গেছে যুদ্ধের সমস্ত আওয়াজ। যে হতভাগ্যরা এই ঘর এই উপাসনাগৃহ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য এক বিপুল দুঃখবোধ আমাকে গ্রাস করে। এই মূর্তিটা তাদের আলো দিত, বিশেষতঃ অন্ধকারে এটা ছিল তাদের সহায়। নিশ্চয়ই ইউরোপ থেকে এটা কেউ তাদের এনে দিয়েছিল, সম্ভবতঃ ইতালি থেকে। তারা এটা কুলুঙ্গিতে রেখেছিল, যাতে অন্ধকারের যে জীবন অধুনা এই উপদ্বীপে চলছিল সেখানে এই মূর্তিটা তাদের দু'ভাবেই আলো দিতে পারে — বাস্তবে এবং আত্মিক চেতনায়। এই অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ে তারা নিশ্চয়ই এই মূর্তিটাকে তাদের অভিভাবক — তাদের রক্ষাকর্তা মনে করত। কেন তারা এটাকে ফেলে চলে গেল? এই উপদ্বীপের কোথাও বা অন্য যে জায়গাতেই তারা চলে যাক না কেন, তারা কি এটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত না? আমি এখানে যারা ছিল তাদেরকে কল্পনা করার চেষ্টা করছি — হয়তো কমবয়সী ছেলে আর মেয়েরা যারা এখন পৃথিবীর নানা জায়গায় আশ্রয় চেয়ে বেড়াচ্ছে, অথবা তারা 'ইলম'-এর জন্য লড়াইতে যোগ দিয়েছে।

এই মুহূর্তে আমার নিজের ভাই-বোনেদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ওরা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আমার কথা মনে করে। আমার কেমন অনুভূতি হ'ত যদি আমি বাড়ি ফিরে দেখতাম সব ধ্বংস হয়ে গেছে, আর সেই শূন্যতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমার বুটের ফাঁপা আওয়াজ আমার কানে এসে বাজত? আমি ভাগ্যবান যে আমার ফিরে যাওয়ার জন্য একটা বাড়ি আছে, একটা আহ্বান আছে, যেদিকে আমি এগিয়ে যেতে পারি। দক্ষিণে আমাদের বীর বলে দেশপ্রেমিক বলে গণ্য করা হয়, ভাবা হয় যে আমরা মাতৃভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে উৎসুক। অথচ খুব বেশিদিন আগে নয়, যখন আমাদেরকে অন্য চোখে দেখা হত। যখন সেই বিপ্লব, সেই 'ভীষানায়া' গর্জে উঠেছিল আমাদের দেশে, তখন এই একই সৈন্যদল সে আন্দোলনকে

হিংস্র কায়দায় দমন করেছিল আর সে সময়ে আমাদের দেখা হ'ত ভয়ের চোখে, ঘৃণার চোখে।

আমাদের যে কতরকম ভূমিকায় নামতে হয়, আর প্রত্যেকটার মধ্যেই দ্বিচারিতা, পরস্পর বিরোধী বিপরীতধর্মী ভূমিকা। আমি যে কতরকম ভূমিকায় অভিনয় করি — মৃত শত্রুপক্ষের শব কবর খুঁড়ে বার করাকে আমায় সমর্থন করতে হয়। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। যেমন অনেকে আমাদের রক্ষক ভাবে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে রক্ষকের ভূমিকায় আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করি; সেখানে বাবা-মায়েরা খুশি হয় যদি তাদের মেয়েরা কেউ একজন সৈনিককে বিয়ে করে।

এখন এই মুহূর্তে এই গোলায় বিধ্বস্ত বাড়িটায় আমি ভাবছি যারা এখানে বাস করত, তাদের আর আমার মধ্যে তফাৎটা কী? তারা নির্বাসনে গেছে। কিন্তু বস্তুতঃ আমরাও নির্বাসনে আছি। আমরা বাধ্য হয়েছি আমাদের পরিচিত ঘর ছেড়ে চলে আসতে, চলে আসতে সেই জীবন ছেড়ে যা আমাদের পরিবারগুলো বংশানুক্রমে যাপন করে চলেছে।

তোমার সামনে কী আছে না জেনে এগিয়ে যেতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাহস লাগে, দরজা বন্ধ না করেই বেরিয়ে যেতে তোমার দ্বিধা লাগে না, কারণ যা তুমি কখনও আর চোখেও দেখবে না সে সমস্ত জিনিসপত্র দরজা বন্ধ করে রেখে লাভ কী? যে বিছানায় তুমি প্রতিরাতে ঘুমাও, যে টেবিলে তুমি বসো, যে মাদুরটা তুমি পাতো — তোমার প্রাত্যাহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই জিনিসগুলো হঠাৎ তোমার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। জীবন ছাড়া কিছুতেই কিছু এসে যায় না। বাঁচতে হয়। তুমি শুধু সেটুকুই নিয়ে যাও যেটুকু তুমি বইতে পারো বা যেটুকু তোমার ঠেলাগাড়িতে ঠেলে নিয়ে যেতে পারো।

যখন তুমি চলে যাচ্ছ, তখন তুমি জানোও না কখনও ফিরবে কি না। আর ফিরে আসা কটু হতে পারে, যদি তুমি ফিরে এসে দেখো, তোমার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভালোবেসে যা যা দিয়ে তুমি ঘর ভরেছিলে, যেসব সামগ্রী এই ঘরকে তোমার করে তুলেছিল, সে সব অদৃশ্য কেউ নিয়ে চলে গেছে। তোমার হঠাৎ খুব শীত লাগে যখন তুমি বুঝতে পারো, ফেরা অসম্ভব, তোমাকে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

এক আশ্চর্য দেশে আমরা কী করে প্রভুর গান গাইব?

জিয়নকে স্মরণ করে আমরা কাঁদলাম ...

আমি এখানে একজন অনুপ্রবেশকারী, একজন অচেনা মানুষের বাড়িতে আমি ঢুকে পড়েছি, কিন্তু আমার পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি এখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতেও পারবনা। সে ক্ষেত্রে আমাকে পলাতক সেনা হিসেবে ধরা হবে এবং আমার কোর্ট মার্শালে শাস্তি হবে। আমাকে অনবরত মেনে নিতে হবে, শুধু আদেশ পালন করে যেতে হবে। এই তখন এইটা আমার এক মুহূর্তের একাকীত্ব, যে সমস্ত নিয়মনীতির নিগড়ে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছি তার থেকে আমার এই এক মুহূর্তের মুক্তি।

আমার ভিতরে কিছু একটা ঘটছে, এটা হঠাৎ কিছুর প্রকাশ নয়, কেবলমাত্র আমি যা অনুভব করি ... আবার মানুষ হওয়ার মতো একটা বোধ ... আবেগ ও অনুভূতি থাকার বিলাসিতা... সরল আবেগ... চিন্তার জটিলতা বয়ে আনার কোনও প্রয়োজন ছাড়া। এই বাড়িটা যাদের তাদের কথা আমি ভাবতে থাকি। ঠিক আমার আত্মীয়-স্বজনরা হলে যেমন ভাবতাম, তারা যদি এই অবস্থায় পড়ত তাহলে কী করত? তারা যাতে তাদের এই ঘরে ফিরে আসতে পারে, উৎখাত হওয়ার অনুভূতি থেকে যাতে মুক্তি পেতে পারে, বাকি পৃথিবীর চৈতন্য থেকে যাতে নির্বাসিত না হতে পারে তার জন্য আমি তাদের সাহায্য করতে চাই। শুধুমাত্র এই আলো বিচ্ছুরণকারী মূর্তিটা নয়, এই পরিত্যক্ত গ্রামের শূন্য কুটিরগুলোও আমাকে ভাবিয়েছে। আমি ভাবছি, আমরা এগিয়ে আসছি শুনে এই গ্রামবাসীদের মনে কী হয়েছিল — আমরা অর্থাৎ যারা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলোয় নিজেদেরকে মুক্তিদাতা বলে ভাবি। আমার মনে পড়ে অনেকদিন আগে আমি একটা বই পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল — প্রথমে অনেকে ভেবেছিল স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলোর হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী এসেছে। কিন্তু তা পালটে গেল। পালটে যাওয়াই নিয়ম... কিন্তু তা সবসময় ভালোর দিকে পাল্টায় না ...

একটা ভাঙা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। গীর্জার রঙিন কাঁচের জানলা থেকে যেমন আলো ছড়ায় ঠিক তেমনভাবে আলো আসছে মূর্তিটার ভেতর থেকে। গীর্জার ধ্বংসাবশেষে বসে হাঁটুমুড়ে বসে আমি কি প্রার্থনা করতে পারি? আঁকতে পারি বুকে ক্রুশচিহ্ন? আমাদের জীবনগুলোর এখন কিছু মানে দাঁড়াতে পারে যদি আমরা সেগুলোকে 'প্যারাব্‌ল'-এর রূপক কাহিনীর মতো করে ভাবি। একজন খুব ভালো পরোপকারী ব্যক্তিকে নিয়ে 'প্যারাব্‌ল অফ্ দ্য গুড সামারিটান' বলে একটা গল্প আছে, কিন্তু একজন সাধারণ সৈনিককে নিয়ে একটা 'প্যারাব্‌ল' নেই কেন? একজন সেনানায়কের মেয়েকে নিয়েও একটা কাহিনী আছে — যে মেয়েটা বিশ্বাসের জোরে বেঁচে গিয়েছিল। আমার অনেক বন্ধু বাইবেলের একানব্বইতম প্রার্থনা সঙ্গীতটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগে ভরে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। আমাকেও মা একটা দিয়েছে, আমি চামড়ার ব্যাগে আঙুল ছুঁইয়ে ওই পবিত্র বাণীকে স্পর্শ করি আর নিশ্বাস চেপে প্রার্থনার শব্দগুলো উচ্চারণ করি। একটা ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডার আছেন যিনি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে বেরনোর আগে সবাই মিলে হাঁটু গেঁড়ে প্রার্থনা করে। স্তবগানের শেষে তারা যখন 'ধন্যপরমেশ্বর' বলে ধ্বনি দেয় তখন তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। এই ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে কম।

তিনি আমার আশ্রয় আমার কেল্লা, তাঁর দুই পাখা দিয়ে তিনি আমাকে ঢেকে রাখবেন, আমাকে রক্ষা করবেন। খ্রিস্টের সঙ্গে যে সমস্ত চিত্রকল্প আমরা সংযুক্ত করি তা আমাদের রক্ষা করার। বিপদে আমরা উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের অভিযানগুলো অনেক সময়ে মৃত্যুকে ডেকে আনে। আমরা শত্রুদের ধ্বংস করতে চাই, তাদেরকে ক্ষমা করতে চাই না।

এই নীরবতার মাঝে থমকে খ্রিস্টের মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। আমি মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করি তাঁকে কী কী নামে আমি জানি : মানবজাতির ত্রাণকর্তা, স্যালভাতর মুণ্ডি, জগতের আলো, ভালো রাখাল, ঈশ্বরের ভেড়া ...

মূর্তিটা থেকে যে আলো বেরিয়ে আসছে তা মনে হয় এই জগতের আলো স্বরূপ, এর জন্যই বোধহয় এতগুলো অন্ধকার বছর আমি অপেক্ষা করে আছি।

খ্রিস্টের ভাঙা হাতটা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে পালির কথা — সেদিন ওর ডান বাহুতে আর পায়ে গুলি লেগেছিল। নিজের রক্তের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ও বিপদ মুক্ত জায়গায় পৌঁছেছিল — বেঁচে থাকার তীব্র প্রবৃত্তি ছিল ওর চালিকা শক্তি। ও বাঁচত না, হঠাৎ যদি না অযাচিতভাবে তীরের কাছে একটা নৌকা পাওয়া যেত, নৌকাটার ওখানে তখন আসার কথা ছিল না। কেউই বাঁচত না। কিন্তু বেঁচে গেল। পালি

বেঁচে গেল হাতে ছত্রিশটা সেলাই নিয়ে। কলম্বোতে সেনা হাসপাতালে পালি যখন ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছিল, তখন দেখত বাইরে বিএমডবলু আর পাগেরো গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে, 'গল–এ ফেস গ্রীন' হোটেলে নাচ হচ্ছে। সে আমায় বলেছিল, যে তার অবাক লাগে, মনে হয়, মানুষ কি জানে উত্তর আর পূর্বদিকে যুদ্ধ চলছে? মহাপ্লাবনের মতো কিছু না ঘটলে মানুষ কি কিছু বুঝতে পারে? পালির সারাদেহ নিজের রক্তে চান করেছিল, ওর পোষাক আর যে মাটির ওপর দিয়ে ও হামা দিয়েছিল তা রক্তে ভিজে গিয়েছিল। উগ্রপন্থীদের ও এত কাছ থেকে দেখেছিল যে তাদের মিখের অভিব্যক্তি চোখে পড়ছিল — একটা দৃঢ়সংকল্প উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি — ধ্বংসের। ও বুঝতে পেরেছিল, লড়াইটা কী সুতীব্র হবে, উগ্রপন্থীরা সংখ্যায় ছিল বেশি, মহিলারাও যুদ্ধে এসেছিল, যুবতী মেয়েরা ...

ও আমায় বলেছিল, তারা যে একটা লক্ষ্য নিয়ে লড়াই করছিল সেটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তাদের মন আর অন্য কোনও দিকেই ছিল না। তাদের কি খ্রিস্টের কথা মনে পড়েনি যিনি আমাদের সবার জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন? তারা কী করে ভুলে গেল পরস্পরকে সহায়তা করে বেঁচে থাকার কথা? আমাকে স্মরণ করে এটা খাও, আমাকে স্মরণ করে এটা পান করো। শান্তির মাঝেই ঈশ্বর ...

এত রক্তপাত ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর দেখে মনে হচ্ছে না এই সংঘর্ষের কোথাও শেষ আছে।

খ্রিস্টের এই মূর্তিটা নিয়ে আমি কী করব? এই বিধ্বস্ত বাড়িতে আমি এটাকে রেখে যেতে পারছি না। আমি জানি যন্ত্রণা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। ওরা তাঁকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল। তাঁকে উপহাস করেছিল। তাঁর সময়কালে তাঁকে ক্ষতিকারক, ধ্বংসকারী ভাবা হত যিনি কিনা রোমের প্রবল ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তবু আজ যে সব নামে রূপে আমরা তাঁকে মনে রাখি তার মধ্যে এই পার্থিব ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারী হিসেবে তাঁর যে রূপ সে সম্বন্ধে আমরা নীরব থাকি।

আমি কি মূর্তিটা আমার সাথে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাব, সেখান থেকে দক্ষিণে? আমার এটা নেওয়ার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের একটা হাত ভাঙা দেখে, আমার আহত সাথী আর এই ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষগুলোর কথা ভেবে আমি নিজের সেই আবেগ আর সামলাতে পারছি না যে আবেগ আমার থাকার কথা নয়। জনগণের গৃহ থেকে কোনও জিনিস গ্রহণ করবে না — নিয়মে তাই বলা আছে। আমি জানিনা, আমার আবেগ প্রশমনের জন্য, আমি এই ঘরের অধিবাসীদের প্রতি যে করুণা বোধ করছি তা খ্রীষ্টের ভাঙা মূর্তিটায় প্রত্যর্পণ করতে চাইছি কি না। যদি এটা অন্য কোনও মূর্তি, অন্য কোনও দেবতার হত? আমি হয়ত এটাকে ফেলেই যেতাম। আমি আমার টি–ফিফটি–সিক্স রাইফেলটাকে একটা হাতে ধরি। অন্য হাতে মূর্তিটাকে কুলুঙ্গি থেকে সাবধানে নামাই, আমার বুকের কাছে একটুক্ষণের জন্য জড়িয়ে ধরি, তারপর এটাকে আমার কিটব্যাগে ভরে নিই। বাড়িটার বাইরে আমি বেরিয়ে আসি, চারিদিকে সতর্কভাবে তাকাই — আমার দুটো হাত এখন মুক্ত, রাইফেলটাকে ধরার জন্য।

অনুবাদক : অমিতাভ সেন

যখন স্মৃতির মৃত্যু হয়

'কাল তোমাকে যেতেই হবে?' পারাকাকা বিজয়কে জিজ্ঞাসা করে। দু'জনে বসে দেবীর দেওয়া চা আর মুরুক্কু খাচ্ছিল।

— হ্যাঁ দাদু। আমাকে ফিরে গিয়ে সোমবার কাজে যোগ দিতেই হবে। আমার খারাপ লাগছে, পরের বার এসে আমি ...

— হুম্, আচ্ছা, পরের বার। তাহলে তুমি শুতে যাওয়ার আগে আমায় বলো তোমাদের ওখানে এখন কী ঘটছে। আয় যোগী, তুমি বরং আমায় বলো তোমরা, শহরের তরুণ তুর্কীরা এখন কী নিয়ে ব্যস্ত।

— সত্যি বলতে কি, খুব বেশি কিছু বলার নেই। — বিজয় শুরু করে। কিন্তু দু'ঘন্টা পরেও সে দাদুর কৌতূহল খুব একটা নিবৃত্ত করতে পারে না। তখনও যোগীর কথা শোনাই হয় নি।

ইতিমধ্যে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে, বাতাস ভারী, আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে পারাকাকা বলে, 'বৃষ্টি আসছে, মনে হচ্ছে সত্যিই এবার নামবে, ছেলেটা যে কোথায় গেল, তাই ভাবছি।'

'কে?' বিজয় প্রশ্ন করে।

— রবি, আমার নাতি, দেবীর ছেলে। ওর আবার নানা ফিকির।

— ও হ্যাঁ, আমার মনে আছে। ও তখন খুব ছোটো ছিল —

— এখন আর ছোটো নেই, আমার ভয় করে সে এখন লায়েক হয়েছে। নিজের ইচ্ছে মতো চলে যেখানে খুশি যায়, কাউকে বলেও না কোথায় যায়।

— কিসের ফিকির বলছিলে?

'নিজের মতলবেই চলে' — পারাকাকু তার দুঃখের ফিরিস্তি দিতে থাকে।

দেবী এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। কারণ বহুদিন তার ইংরেজি বলার অভ্যাস নেই। এখন সে তামিল ভাষায় তার বাবার কথার প্রতিবাদ করে। যোগী তার কথায় ঘন ঘন মাথা নাড়ে, বিজয় তার কথার ধারা বুঝতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি তাকে জোর করতে থাকে বিজয়কে কথাগুলো বুঝিয়ে বলার জন্য।

— 'ওকে বলো, বলো ওকে, তোমার মাথায় যখন কথাটা এসেছে, ওকে বলো'। দেবী বলে। থেমে থেমে ইংরেজি আর তামিল মিশিয়ে বিজয়কে বলে। তার ধীর স্বরে মিশে থাকে এক গভীর অনুভূতি — সে বিজয়কে বলে, লঙ্কা আর পেঁয়াজের যে সবুজ খেত বিজয় চারপাশে দেখেছে সেগুলো কেবলমাত্র আশার শ্যামলিমা, সত্যিকারের প্রত্যাশা নয়। 'ওদের' সরকার ভারত থেকে সস্তাদরে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে বাজার ছেয়ে ফেলেছে, এখানকার মানুষের নিজেদের ফসলগুলো বিক্রি করার কোনও বাজার নেই। বাজার ছাড়া বাজারের জন্য তরকারির বাগান বানিয়ে কী লাভ?

সরকার ওদের সাথে এরকম সব ব্যবহার করছে, দেবী আরো আবেগের সাথে বলতেথাকে, এর একমাত্র কারণ ওরা তামিল। এবার দেবী তামিল ভাষাতেই বলতে থাকে, কিন্তু এভাবে ওদেরকে পালটানো যাবে না। এটা সরকার কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না, 'তারা ওদের জমি কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে ওদের বাজার, ওদের চাকরি, ওদের শিশুদের শিক্ষা কিন্তু ওরা তামিলই রয়ে গেছে, আর তামিল হিসেবেই

মরবে। তারা সেই পরিচয়টা কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না।' — এই বলে টেবিল থেকে চায়ের কাপ-প্লেটগুলো তুলে নিয়ে দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পারাকাকা বিষন্ন ভাবে মৃদু হাসে। দেবী কখনও প্রকাশ্যে এত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে না। এটা ঠিক দেবীর মতো শোনাল না। কিছু একটা পাকিয়ে উঠছে, ওর ছেলেটার ব্যাপারে কিছু করা দরকার, সে কিছু একটা করছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আর দেবী তার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করছে।

'তোমার আসার পথে তুমি নিশ্চয়ই এরকম সব ছোটো ছোটো জমির টুকরো দেখেছো?' বলে রবির খেতের দিকে বৃদ্ধ হাত দেখায়।

বিজয় ঘাড় নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ, যোগী আমায় দেখিয়েছিল। এত সবুজ আগে আমি এখানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'তুমি আগে দেখোনি, কারণ তখন এমন ছিল না। এটা শুধু জলের জন্য বা ইলেক্ট্রিক পাম্প সস্তায় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে নয়' — — বৃদ্ধ চুরুট ধরানোর জন্য থামে। যোগী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে।

'এর আরেকটা কারণ হ'ল, নতুন প্রজন্মের আর কোনও যাওয়ার জায়গা নেই বলে তারা সব জমিতে গিয়ে কাজ করছে। তোমাদের সরকার সমস্ত রকমের বিকল্প পথ বন্ধ করে দিয়েছে। চাকরি নেই, উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। (যোগী ঘাড় নেড়ে প্রবল সম্মতি জানায়)। কিচ্ছু নেই।'

'কলম্বোর তামিলরা বিদেশে যেতে পারে, শহরের তামিলরা মধ্যপ্রাচ্যে যেতে পারে, গ্রামের ছেলেরা শুধু ফিরে যেতে পারে তাদের ছোট্ট জমির কোলে আর চেষ্টা করতে পারে সেখানে কিছু করার।'

তাঁর চুরুট নিভে যায় কথা বলতে গিয়ে। তিনি ভিজে অংশটা চিবোতে থাকেন, থুতু ফেলেন, বার বার জ্বালতে চেষ্টা করেন, তারপর হাল ছেড়ে দেন।

'এই যোগী, তুমি কি কখনও গ্রামে এত যুবক ছেলের ভীড় দেখেছো। সুদুমালিয়ার খবর কী? সেখানেও কি একইরকম?'

'হ্যাঁ দাদু, তুমি ঠিক বলেছো' — যোগী ঘুমজড়ানো স্বরে বলে, 'আমি এরকম আগে কখনও দেখিনি।'

'বিজয়, তোমার বাবা যখন ছোটো ছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনও এত তরুণ ছেলেকে চারপাশে এমন বেশি সংখ্যায় দেখিনি। ওরা কঠিন পরিশ্রম করছে জীবিকা অর্জনের জন্য। অনেকে এমন সব জিনিস করেছে যা জাফনায় কখনও আগে শোনা যায়নি। আমি শুনেছি সুদুমালাইতে এরা আপেল ফলিয়েছে। আপেল! তাই না যোগী?'

'কিন্তু কী কাজে লাগবে? দেবী যা বলল, কোনও বাজার তো নেই। তোমাদের সরকার সেটাও কেড়ে নিয়েছে। এইসব তরুণ যুবকেরা তাই চাষের উৎসাহও হারিয়ে ফেলেছে।'

'দ্যাখো' বলে তিনি রবির খেতের দিকে আঙুল তোলেন আবার, 'ওর বন্ধুরা আসে আর ও কাজ বন্ধ করে, কাজ ফেলে রেখে তাদের সাথে কথা বলে। কী লাভ কাজ করে? রবির মতো এরকম সব তরুণ ছেলেতে গ্রাম ভর্তি এবং তারা কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে।' তিনি তাঁর চশমাটা খুলে নিয়ে বিষাদগ্রস্ত গম্ভীর স্বরে বলেন, 'ওদের অতীত কেড়ে নিয়েছিল ব্রিটিশরা, সিংহলীরা কেড়ে নিয়েছে ওদের ভবিষ্যৎ। যা ওদের আছে তা কেবল বর্তমান। এবং এটাই ওদের বিপজ্জনক করে তুলেছে।'

প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল আর শুরু হ'ল বৃষ্টি।

....

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার পথে বিজয় অ্যারেস্ট হয়ে গেল। সে সারাদিন ধরে পাশের গ্রামের ভোটারদের একটা পুরনো লড়ঝড়ে ভ্যানে চড়িয়ে ভোটের বুথে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বিকেলে ভ্যানটা সবে জমা দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে এমন সময় দু'জন লোক এসে তাকে থামালো। বিজয় ঘাবড়ায়নি। কারণ ভোট খুবই শান্তিতে হয়েছিল। সরকারের গুণ্ডাবাহিনীও আসেনি, সে বিনা বাধায় সারাদিন ঘুরেছে, তাকে কেউ হেনস্থা করেনি বা গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু সে কখনও অনুমান করেনি যে সন্ধ্যার মুখে একটা নির্জন রাস্তায় দু'জন সাদা পোষাকের পুলিশ তাকে দাঁড় করাবে এবং একটা গাড়িতে তুলে কলম্বোয় চালান দেবে। গ্যাংস্টারদের নিয়ে সিনেমায় যেমন দেখানো হয় ঠিক সেরকম। এমনকি যে লোকদুটো তাকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদেরকে দেখে সিআইডি অফিসার বলে মনে হয়, তারা দেখতে এওয়ার্ড জি ও পিটার লোরের মতো — এবং যেমনটি হয় — তাদের মুখে কোনও কথা নেই। বিজয়ের কোনও প্রশ্নেরই তারা উত্তর দেয় না, শুধু বলে তাকে কলম্বোয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। লোকদুটো আইনজীবী কিনা সেটাও বিজয় নিশ্চিত হতে পারছিল না। কারণ সরকারের কায়দাটা হচ্ছে খোলাখুলি হিংস্র আক্রমণ, এ ধরনের হঠাৎ গোপন দুর্বৃত্তদের মতো নয়। একমাত্র যখন সেই কুখ্যাত কেন্দ্রীয় সিআইডি অফিসের চারতলায় সে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল তখনই বুঝতে শুরু করল যে সে বেশ কঠিন ঝামেলায় পড়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের ঘরটা ছিল লম্বা আর মলিন। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে একটা শক্ত মেহগনি কাঠের টেবিল, একটা বড়ো মেহগনি চেয়ার আর একটা টুল টেবিলের দু'মাথায় রাখা। লোকদুটো তাকে টুলটায় বসিয়ে চলে গেল কিছু না বলেই। বিজয় তাদেরকে ডেকে এক গ্লাস জল চাইল, তারা তা শুনতে চাইল না।

বিজয় টুলে বসে সামনে ঝুঁকে পড়ল, ভাবল সামনের দরজা দিয়ে কেউ আসবে, কিন্তু কেউ এল না। সে উঠে ঘরের একমাত্র জানলাটার দিকে এগিয়ে গেল, জানলাটা বন্ধ আর চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা, বাইরে কিছু দেখা গেল না। পকেটে যে কাগজগুলো ছিল সেগুলো বের করে নিয়ে বিজয় পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই বিশাল ঘরের ছাদে অনেক উঁচুতে যে হলদেটে আলোটা জ্বলছে তা এতই কম যে পড়া সম্ভব না। সে ঘরের মধ্যে কয়েকপাক হাঁটল, যাতে মনের জোর না হারিয়ে যায়, কিন্তু সে খিদে আর ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বাইরে দরজার কাছে খানিক বাদেই একটা ঘন্টা বেজে উঠছে আর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না। ফিরে এসে কাগজের টুকরোগুলো মুখের লালায় ভিজিয়ে কানে গুঁজে দিল, তারপর টেবিলের নিচে মেঝের ওপর শুয়ে ঘন্টার শব্দের ফাঁকগুলোতে ঝিমোতে থাকল।

সকালে লোকদুটো এসে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে তুলে দিল। তাদের চোখদুটো ঘোলাটে, ঘুমের রেশ লেগে আছে। বিজয়কে টুলে বসিয়ে দিয়ে একটাও কথা না বলে তারা দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল। পাঁচ মিনিট পরে আরেকটা লোক এল, এসে ভয়ঙ্কর চোখে বিজয়ের সামনে দাঁড়াল। লোকটা বিশাল, বিপুল, ছয়ফুটের ওপর লম্বা আর প্রায় ততখানি চওড়া, বিজয় যেখানে বসে সেখান থেকে ওরকমই মনে হ'ল, লোকটা প্রায় যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো। কামানো মাথার নীচে ক্ষুদে তীক্ষ্ণ চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, ভারী চোয়াল আর থলথলে মুখটা পাপে পূর্ণ। গায়ের রঙ ফরসাই বলা চলে, পরনে সাদা স্যুট। সুশীল সমাজের

কেউ? – বিজয় এলোমেলো চিন্তা করে – সে কি লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে? খবরের কাগজে? লোকটা সরে গিয়ে বিরাট মেহগনির চেয়ারটায় বসল – হ্যাঁ, ঠিক, এই চেয়ারটা এই লোকটার জন্যই মানানসই, লোকটার চেহারার সঙ্গেও মানানসই, না লোকটা স্টেশনের ... হতে পারে লোকটা স্টেশনমাস্টার ... বিজয় ট্রেন চালাতে পারত... বিজয়ের মাথার ভেতরটা হালকা... তাকে কিছু খেতে হবে... এক্ষুণি ... লোকটাকে বলবে?

'স্যার, একে কি আমরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করব?' — কার যেন একটা গলা।

'না, না। তার দরকার নেই।' — লোকটার গলার স্বর কর্কশ আর ঘ্যাড়ঘেড়ে, যেন একটা কাশি আটকে আছে, কিছুতে বেরোচ্ছে না, 'আমি কাগজপত্র সব দেখেছি।'

বিজয় মাথা নাড়তে শুরু করে। সে নিশ্চিত যে লোকটাকে কোথাও দেখেছে। আমরা তোমার সবকিছুই জানি, লোকটা বলে যাচ্ছিল, সরকারের বিরুদ্ধে তোমার ষড়যন্ত্র। তোমাদের ভাইস–প্রিন্সিপাল খুবই সাহায্য করেছে ... ওদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ... তোমাদের পিএলএফ ...

'আমার দিকে তাকাও, যখন আমি তোমাকেই বলছি,' লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে আর অমনি তার দুই শাগরেদ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বিজয়ের মাথা খাড়া করে।

'থাক্ থাক্, ওর গায়ে হাত দিও না। আমরা আইনমাফিকই সবটা করব। ওর যোগাযোগ আছে'। লোকটা মুখ দিয়ে চক্‌চকাস আওয়াজ করে, থামে, আবার আওয়াজ করে — চক্‌চকাস আর প্রতিবার আওয়াজ করার সময় চিবুক নাচায়। বিজয় এই আওয়াজটা চেনে, সে আগে শুনেছে, নিশ্চয়ই শুনেছে, লোকটা আবার আওয়াজ করে, হ্যাঁ এইবার বোঝা গেছে — সে ছিল সিডনি গ্রীনস্ট্রীট, ঠিক মনে পড়েছে, 'দি ম্যালটেস ফ্যালকন'–এর সিডনি গ্রীন স্ট্রীট। বিজয়ের আগেই মনে পড়া উচিত ছিল, ওই হাসি যে কোনও জায়গায় দেখলেই মনে পড়ার কথা, লোকটা একসময় লঙ্কাদ্বীপের চা বাগানের মালিক ছিল, কুলিদের পেটানোর সময় এই চিবুক নাচানোর আওয়াজ আর হাসি সে রপ্ত করেছিল।

'ওকে নিয়ে যাও, আর নিয়ে গিয়ে ওয়েলিকাড়েতে ঢোকাও। ওরাই ওর ব্যবস্থা করুক।'

বিজয় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল — আমি একজন উকিলের সাথে দেখা করতে চাই, বউকে একটা ফোন করতে দিন, তাহলে একজন বন্ধুকে, আপনারা এইভাবে আমাকে ধরে জেলে পুরতে পারেন না, এরকমভাবে কোনও বিচার না করেই ... লোকটা আওয়াজ করল চকচকাস।

'ওকে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছু রুটি আর জল দিও' — সঙ্গের পুলিশ দু'জনকে এই নির্দেশ দিয়ে লোকটা চলে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা লোকদুটো এসে বিজয়কে নিয়ে গেল ওয়েলিকাড়ে জেলখানায়। সেখানে তাকে একজন ওয়ার্ডেনের হাতে তুলে দিল। ইতিমধ্যে বিজয় বুঝে গেছে যে তাকে একজন সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ধরা হয়েছে এবং কোনও বন্ধু বা কোনও উকিলের সাথে তাকে দেখা করতে দেওয়া হবে না। ওয়ার্ডেনকে দেখে মনে হ'ল নরম মানুষ — চাঁদের মতন গোলমুখ, চাঁদের মতন গোল দেহ। বিজয় তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু চাঁদমুখো তার দিকে তাকালোও না, এবং তাকে তুলে দিল একজন প্রহরীর হাতে। প্রহরী তাকে নিয়ে চলল বন্দীদের ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। ঘরগুলো থেকে চেঁচামেচি আর বকবকানির আওয়াজ আসছে। সেগুলো ছাড়িয়ে জেলের অব্যবহৃত একটা অংশে নিয়ে গিয়ে একটা নির্জন সেলে তাকে ঢুকিয়ে দিল। এবং হঠাৎ বিজয় ভয় পেতে শুরু করল। ওরা শুধু তাকে বন্দী করে রাখতে চাইছে না, ওরা গোটা পৃথিবীটাকেও বন্দী করে তার বাইরে বিজয়কে রেখে দিতে চাইছে, রেখে দিতে চাইছে অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে। কারো কাছে সে যেতে পারবে না, কেউ তার কাছে আসতে পারবে না, কেউ জানবে না সে কোথায়, তাকে অজ্ঞাত পরিচয় করে তোলা হচ্ছে। ভয় তার মাথায় চড়ে বসে এবং একটা আর্তনাদ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আর্তনাদটা তার মুখগহ্বরে শুকনো তালুতে আটকে যায়। হতাশ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর অসংখ্য দিন বিজয় একমাত্র মানুষ হিসেবে শুধু নির্বাক জেলারের দেখা পেল, খাবার সময়, আর নোংরা ফেলতে বাথরুমে গেলে। খাবার অখাদ্য ভাত, বেশির ভাগ সময় আধসেদ্ধ চাল, একটা শুকনো 'মালাঙ' বা নারকেলের পচা 'সম্বর' আর কখনও কোনও বিশেষ উপলক্ষ্যে এক টুকরো মাছ — বরফচাপা, বিস্বাদ। সেলের ছোট্ট, সংকীর্ণ ঘরে গরাদের ফাঁকটুকু ছাড়া কোনও জানলা নেই, সারাক্ষণ তার নিজের পায়খানার গন্ধে ভরা। একসময় যা সে ভেবেছিল সুষম খাদ্য, এখন তা তার কাছে সুষম শাস্তি, একসময় যে নির্জনতাকে সে পছন্দ করেছিল আজ তা তার কাছে বোঝা।

দিনে একবার প্রহরী তাকে একটা পাঁচিল ঘেরা উঠোনে নিয়ে গিয়ে আধঘন্টা কুকুরের মতো হাঁটায়। সে পড়ার জন্য বইপত্র চেয়েছিল, পায়নি। সে জানতে চেয়েছিল, ওরা তাকে নিয়ে কী করতে চায়, কোনও উত্তর পায়নি।

চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলার পুরনো ভাবনাটা আরো জোরের সঙ্গে ফিরে আসে, এখন ভয়টা চলে গেছে। কিন্তু ভয়ের স্বীকৃতিটুকু রয়ে গেছে। বিজয় চিন্তা করার চেষ্টা করে, শুধু চিন্তা করতে পারাটাকে জিইয়ে রাখার জন্যই। সে নিজেকে গল্প বলে, দুনিয়ার কথা মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে যে তার মনটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে, পরিচয় নামক বিষয়টির সাথে সংযোগ হারিয়ে যাচ্ছে, পরিচিত জিনিসগুলোর স্পর্শ তার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে, সেগুলোকে তার থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে — মানুষ, সময়, বই, হাসি। সে আর এখন তার এই বিচ্ছিন্নতাকে অনুভব করতে পারে না, একটা শূন্যতার মধ্যে সে থাকতে অভ্যস্ত ... শেষবারের মতো সে একবার ভাবল ... এইভাবে তুমি পাগল হয়ে যাবে, এইভাবে তোমাকে ওরা নিখোঁজ করে দেবে তোমার নিজের থেকে এবং গোটা দুনিয়ার থেকে। তাকে এখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তাকে অনুপস্থিত করে দেওয়া হচ্ছে।

অনুবাদক : অমিতাভ সেন

বিষয় : গত সংখ্যার সংশোধন

প্রীতিভাজনেষু
জিতেন

মন্থন সাময়িকীর জুলাই–আগস্ট (২০০৯) সংখ্যায় হিংসা নিয়ে আমাদের যে–আলোচনাটা ছাপা হয়েছে তার পৃ.৭–এর এই বাক্যটা একটু সংশোধন করা দরকার — "পণ্ডিচেরীতে অরোভিলে আমি শুনেছি ১৩০টা নেশনের লোকেরা একত্রে থাকেন, ওঁদের কোনো নেশন নেই ...।" অরোভিলের ইউনিভার্সাল টাউনশিপ প্রজেক্টের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৮–র ২৮ ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে শুরুতে প্রতিনিধিত্ব ছিল ১২৪টি দেশের। আর

বর্তমানে সেখানে বসবাস করেন ৪২টি দেশের মানুষ। অরোভিলের আদর্শ ধরা আছে অরোভিলের চার্টার–এ। নেশন স্টেট উতরে যাবার ধারণা এই চার্টার–এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বাস্তবে তা কবে সম্ভব হবে সে ভবিষ্যতের ব্যাপার। চার্টার–এর ধারাগুলি নীচে তুলে দিলাম :

1. Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville one must be a willing servitor of the Divine Consciousness.
2. Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a youth that never ages.
3. Auroville wants to be the bridge between the past and the future. Taking advantage of all discoveries from without and from within, Auroville will boldly spring towards future realisations.
4. Auroville will be site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual Human Unity.

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে —

২২.১০.২০০৯ সৌরীন ভট্টাচার্য

শর্মিলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কবিতা : মায়ের সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

শর্মিলা : প্রায় পাঁচ বছর আগে। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া রয়েছে। আমার কাজ সম্পন্ন হলেই মা আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কবিতা : এটা তো আপনাদের দুজনের পক্ষেই যথেষ্ট কঠিন ...

শর্মিলা : না তেমন কঠিন নয় ... (একটু থেমে) কারণ কী করে আমি বোঝাব, আমরা প্রত্যেকেই একটা কর্তব্য পালন করতেই এখানে এসেছি। আর এসেছি সকলে একাই।

কবিতা : আপনি পুলিশি হেফাজতে কেন? ঠিক কারণটা কী?

শর্মিলা : এটা আমার ইচ্ছায় নয়। কিন্তু সরকারের কাছে (এই অনশন) বেআইনি।

কবিতা : কিন্তু সরকার তো বলছে, আপনার আমরণ অনশন হল আত্মহত্যার চেষ্টা, সেটা তো একটা অপরাধ ...

শর্মিলা : ওরা সেরকম ভাবতেই পারে, আমি কিন্তু আত্মহত্যা করতে মোটেই চাই না। তা যাই হোক, যদি আমি আত্মহত্যা–প্রবণ হই, কীভাবে আমি এবং আপনি, মানে আমরা এই বিষয় অন্যের কাছে জানাব? আমার অনশন একটা উপায়, যেহেতু আর কোন উপায় আমার নেই।

কবিতা : কতদিন আপনি এভাবে চালিয়ে যেতে প্রস্তুত?

শর্মিলা : আমি জানি না। যদিও আশা আমার একটা রয়েছে। আমি সত্যের পক্ষে। আর আমি জানি সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই। ভগবান আমাকে সাহস দিয়েছেন। তাই তো আমি এসব কৃত্রিম উপায়ে (নাকে লাগানো নলটা দেখান) এখনও বেঁচে আছি।

কবিতা : হাসপাতালে আপনার সময় কেমন কাটে?

শর্মিলা : অনেক সময় আমি যোগ অভ্যাস করি। এটা আমার মন আর দেহকে সুস্থ রাখে। (আবার তিনি নলটা দেখান) পরিস্থিতিই সমস্ত কিছুকে স্বাভাবিক রাখে। যদিও এটা (এই নলটা) অস্বাভাবিক, আমার কাছে তা স্বাভাবিক।

কবিতা : আপনি সবচেয়ে কীসের অভাব বোধ করেন?

শর্মিলা : লোকজনের। যেহেতু এখানে আমি একজন বন্দী (হাসপাতালে), কেউই আমার সঙ্গে বিনা অনুমতিতে দেখা করতে পারে না। তাই আমি লোকজনের খুব অভাব বোধ করি।

কবিতা : যদি আপনাকে আপনার একটা ইচ্ছার কথা জানতে চাওয়া হয়, সেটা কী?

শর্মিলা : আমার ইচ্ছা? যুক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমাদের অবশ্যই আত্ম–নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত।

কবিতা : আপনি কি মনে করেন AFSPA রদ হবে? যে কারণের জন্য আপনি লড়ছেন, তা কি আপনি পাবেন?

শর্মিলা : আমি বুঝি আমার কাজটা বেশ কঠিন। কিন্তু আমাকে টিকতে হবে। আমাকে ধৈর্য রাখতে হবে। সেই খুশির দিনটা আসবেই একদিন। যদি আমি বেঁচে থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য রাখতে হবে। (আমাদের সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমাদের তখন বেরিয়ে আসতে হবে। শর্মিলা আমাদের থামিয়ে দিলেন) আপনারা কি আমাকে একটা সাহায্য করবেন? আমি নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী পড়তে চাই। আমার ওঁর সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আপনারা কি তাঁর সম্পর্কে একটা বই আমাকে পাঠাবেন? এখানে খুব কড়াকড়ি। দেখবেন ঠিকানাটা লিখবেন সিকিউরিটি ওয়ার্ড। নাহলে ওটা আমার হাতে পৌঁছাবে না।

(আমরা দিল্লি থেকে ওঁকে বইটা পাঠিয়েছিলাম। শর্মিলার হাতে সেটা পৌঁছেছিল।)

অনুবাদ : জিতেন নন্দী

গড়ে ওঠার পাঠ

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

সেদিন ইস্কুলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, হঠাৎ দেখি একজন শিক্ষক ভয়ংকর উত্তেজিত ভাবে নিচে নামছেন হাতে একটা খাতা নিয়ে। পিছনে পিছনে মাথা নিচু করে চলেছে একজন ছাত্র। শিক্ষকের গন্তব্য প্রধান শিক্ষকের ঘর। এমনি ঠান্ডা ভালোমানুষ মারধোর না করতে পারা সেই

শিক্ষকটিকে এমন অন্য চেহারায় দেখে কৌতুহল হল। আমাকে থামতে দেখে তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন। ক্রুদ্ধ হতাশ সেই শিক্ষক বললেন, ছিঃ ছিঃ এরা ছাত্র!! কাদের জন্য ক্লাসে যাই! অসভ্য। বর্বর, ইতর। আমি ট্রান্সলেশন করতে দিয়েছি, 'আমি সূত্রগড় এম. এন. স্কুলের ছাত্র।' আর এই জানোয়ারটা কী লিখেছে দেখ। তিনি ছাত্রটির খাতা আমার সামনে মেলে ধরলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম খাতায় অনুদিত হবার অপেক্ষায় জ্বলজ্বল করছে কয়েকটি বাংলা এবং একটি হিন্দি শব্দ। ছাত্রটি লিখেছে, আমি সূত্রাগড় এম. এন. ইস্কেলের ...

আমরা কেউ কেউ ভাবলাম গার্জেন কল করার কথা। কেউ ভাবলাম পরপর তিনটি বেত ভাঙা উচিত পিঠে। কেউবা কানাকানি করে হেসে ফেললাম ছেলেটির সত্য কথনে। আমি ভাবছিলাম, এই যে নিজেকে গালাগালি করল ছেলেটি — এ কি শুধুই কিশোর বয়সের সদ্য শেখা বুলি অভ্যাস করে নেওয়ার জন্য? নাকি ও সত্যিই ও নিজেকে তাই মনে করে? রাষ্ট্রের যে কয়েকটি ভদ্র ভদ্র মুখোস আছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে অন্যতম। এই ছেলেটি কি সেই অসার নষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তার ক্ষোভ হতাশা প্রকাশ করল ওই শব্দটি ব্যবহার করে।

রাস্তাঘাটে বাবামায়েরা মাঝেমধ্যেই বলেন, 'একেবারে পড়ে না, যাতে একটু পড়ে বলবেন।' পড়ার প্রতি ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মা বাবার এই আগ্রহ তো দেশ জুড়ে শিক্ষার প্লাবন আনার কথা। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? প্রতিদিন ডিগ্রি সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে আমাদের মূঢ়তা। ইস্কুলগুলোতে যখন ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব সমস্ত জুড়ে, তখন মুর্খতা অসীমের দিকে যেতে চাইছে। পড়া তো ভালো জিনিস। জীবনযাপনের পাশাপাশি পড়ার মধ্যে দিয়েই তো আসে জ্ঞান। সেই জ্ঞান আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে। আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলে। নিজের কষ্টিপাথর গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যে কষ্টিপাথরে ঘষে আমরা হ্যাঁ বা না বলার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমরা বাবা–মা কি সত্যিই চাই, আমাদের সন্তানদের মধ্যে এই গুণগুলি বিকশিত হোক। প্রথম উত্তর মোটেই না। কারণ 'বাবা–মা'–ও আসলে একটি 'ক্ষমতা'–র নাম, যা অন্যদের (সন্তানদের) পদদলিত করে রাখতে চায়। দ্বিতীয় উত্তর, আমরা জানিই না আমরা কি চাই। জানার জন্য কোন আগ্রহও নেই আমাদের। কেননা জানতে চাই বললেই তো মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। অয়দিপাউস। সেই গ্রিকবীর যিনি সত্য জানবার জন্য ভয়ংকর মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁকে সাথী করতে হয়। তার চেয়ে অনেক নিরাপদ এই 'জানা জানা', 'পড়া পড়া', 'ইস্কুল ইস্কুল' খেলার মধ্যে থেকে এই মন্ত্র জপ করা, সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই।

সব্বাই ইস্কুলে যাই। কেন যাই, এর গভীর জিজ্ঞাসা বাদ দিয়ে উপরিস্তরের একটা কারণ আমাদের মোটামুটি জানা। আমি যদি বালো করে পড়ি, ভালো ফল করব। ভালো ফলের জন্য ভালো চাকরি পাব। ভালো চাকরি অনেক টাকা দেবে। অনেক টাকা হলে অনেক জিনিস কিনতে পারব। তাই বাবামায়েরা চান, তাদের সন্তান যেন অনেক জিনিস কেনার মতো সক্ষম হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আমাদের প্রাণহীন অসার মিথ্যে শিক্ষা একশজনের মধ্যে হয়তো দশজনকে কোনমতে বাজারি অর্থে যোগ্য করে তোলে। বাকিরা বিতাড়িত হয় কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে। কিছু না হয়ে ওঠাই তাদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। জন্ম নেয় হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা, নীচতা, ক্রোধ, হীনমন্যতা। এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক একটি ছেলেমেয়ে বাড়ির ফিউজ কেটে গেলে লাগাতে পারে না। বাজারে কেনার ক্ষমতা না থাকলেও বাড়ির উঠোনে দুটি পেঁপে গাছ লাগানো যায়। কাঁচকলা সেদ্ধ করে মেখে খেয়েও পুষ্টি যোগানো যায়। সেই শিক্ষা আমার হল না। সহজ জীবনের পাঠে অভ্যস্ত হতে হতে কেমন করে এই বাজারের বাইরে চোখের আড়ালে নিজেকে গড়ে তোলা যায়, সেই শিক্ষা আমাদের দিল না কেউ।

কাকে বলে গড়ে ওঠা? গড়ে ওঠা তাকেই বলে যা হল নিজের দেহ সুস্থ রাখা, মন শুদ্ধ রাখা। নিজেকে ছোটো নয়, বড়োও নয়। যা আমি সত্যি সত্যি পারি সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে চারপাশের ভালো করতে করতে নিজেকে ভালো রাখো। কোন বিপদ কি বাধা এলে, ভয় না পেয়ে, হতাশ না হয়ে, যা পাচ্ছি তা অপরাজিত মনে মেনে।

প্রতিবাদী চেতনা–র বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা ২০০৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে সিংহলা–তামিল ... ১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সূত্র :

১. Hydraulic Society in Ceylon, E.R. Leach
২. Irrigation and Hydraulic Society in Early Mideaval Ceylon, R. A. L. H. Gunawardana
৩. Modernisation of Sri Lanka's Traditional Irrigation Systems and Sustainability, Lareef Zubair
৪. A History of Sri Lanka, K.M.de Silva
৫. Sri Lanka: History and the Roots of the Conflict, edited by Jonathan Spencer

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net, দূরভাষ : 2491-3666